মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অক্টোবর, ২০২৪
আশ্বিন, ১৪৩১

সূচীপত্র

২২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন ১৪৩১/অক্টোবর ২০২৪

ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্পর্শ		৩
ঈশ্বর সান্নিধ্যে	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
জীবনে-জীবনে ফুটে উঠুক শিবচেতন	তুলি চ্যাটার্জী	১৬
জীবন উদ্ভাসিত ভগবৎ ভাব-স্পর্শে সদাই	বুকু বসু	১৬
পরম সত্যকে হৃদয়ে করতে হবে ধারণ	তানিয়া ঘোষাল	১৮
অন্তরে হয়েছে দিব্য প্রাণ প্রদীপ	সায়ক ঘোষাল	১৯
খেই ছিল হয়ত বা, হারিয়েছেও কখনও	মনোজ বাগ	২০
শ্রীঅনির্বাণ—যেমনটি পেয়েছি।	আশুরঞ্জন দেবনাথ	২৫

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্পর্শ

ব্রহ্মপথটি মানবের অবয়বে সর্বত্র বিরাজমান। অথচ বিশেষ পথ হল ব্রহ্মরন্ধ্র। এটি সরাসরি ব্রহ্মপথ। কেশ-বিভাগ বিন্দুসম স্থান মস্তক শীর্ষে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক উন্মোচন-মিলন দ্বার। সাধকের সাধন চেতন মাতৃস্থান মূলাধার থেকে মাতৃকৃপার আশ্রয়ে যখন উর্দ্ধে উন্মোচিত হতে শুরু হয় ক্রমে সব চক্রগুলি ভেদ করে উর্দ্ধমুখি হয়ে ওঠে চেতন। মূলাধারের যে চেতন কুণ্ডলী সেটি মায়ার আবরণে আচ্ছাদিত। মায়ার অধীন এই চেতন মাতৃকৃপা সঞ্চালন সাপেক্ষ। মনের বিশুদ্ধতার অবস্থায় যদি সঠিক একাগ্র হয়ে ওঠে মনের পরিবেশ, যদি জেগে ওঠে ব্রহ্মপথে এগিয়ে ব্রহ্ম মিলনের তবেই মাতৃকৃপার দ্বার হয় ক্রম উন্মোচিত। যেমন কৃপাসঞ্চার তেমনি জেগে ওঠে তারই মধ্যে জাগরণের শক্তি। মায়ের কৃপার রথে আরোহন করেই সাধন চেতন মূলাধারের কূল-কুণ্ডলিনীর জাল ছিন্ন করে এগিয়ে যেতে পারে। মায়ের কাছেই এজন্য সাধককে নিতে হবে একান্ত শরণ।

সঃ এতম এব সীমানাং বিদার্য এতয়া দ্বারঃ প্রাপদ্যত। (ঐত. উ. ১/৩/১২)

ব্রহ্মরন্ধ্র পথে এই ব্রহ্মচেতন সৃষ্টির সমগ্র পরিমণ্ডল থেকে আবাহন করে নিয়ে আসে ব্রহ্মসত্য। আপাতভাবে ব্রহ্মচেতন হৃদয়েই আশ্রয় নিয়ে নেয়। এই চেতনই জীবাত্মার পরিমণ্ডল চারদিকে ব্যাপ্ত এই চেতন অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মার পরিচয়কে আবৃত রাখে জগদানন্দের বাহ্য ক্লেশ সংস্থান দিয়ে। এখন সাধককে হতে হবে সতর্ক ও প্রয়াসশীল। মাতৃকৃপার যথেষ্ট ভাবে আহ্বানে-নিবেদনে মায়ের আনুকূল্য মেলে। মায়ের আনুকূল্য যখনই জেগে ওঠে সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় সুষুম্না পথে চেতনের উর্দ্ধ আরোহন পর্ব। এমন উর্দ্ধ আরোহনের যে ফলশ্রুতি সেটি হল জীবনের সব জৈব প্রবণতা মুহূর্তে হয়ে ওঠে চঞ্চল। সাধকের সাধন পর্বের প্রাথমিক অবস্থায় নানাভাবে মোহ-মায়ার বাসনা-কামনা-কামশক্তির দাপট আছড়ে পড়ে, সাধককে এখন নিবেদন করতে হবে ভগবানের কাছে। যা কিছু হোক না কেন, এমনকি কামশক্তিও যদি হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে সাধকের ভগবৎ শরণ, ভগবানে নিবেদন আর ক্রমাগতভাবে ভগবানের নামগুণগানের মধ্যে ডুবতে হবে ক্রম পর্যায়ে। মূলাধার পেরিয়ে স্বাধিষ্ঠানই এখন সাধকের চেতন স্থান।

সঃ এষাং বিদৃতিনামঃ দ্বার প্রাপদ্যত — তৎ এতৎ নান্দনম্। (ঐ)

ব্রহ্ম দ্বার পথে জীবের জীবন মাঝে ভগবৎ চেতন প্রবেশ করেন জীবের জানার অতীত এমন প্রবাহে। হয়ে যান হৃদয়মাঝে স্থিত। মূলাধারের চেতন জাগরণপর্ব সূচনা হলেই হৃদয় মাঝে ব্রহ্মচেতন আগ্রহে করেন অবস্থান— মিলন প্রয়াসে। জীব-ব্রহ্মের মিলন ঘটে চেতন পর্বে। অথচ স্বাধিষ্ঠানে স্থিত উপস্থের অঙ্গাদি যেন হয়ে ওঠে প্রতিরোধী। মোহাচ্ছন্ন এই মানব চেতন স্বাভাবিক—সাধারণভাবে কামশক্তির প্রভাবের অধীন। যে প্রাণ করেছে বরণ ঐ ব্রহ্ম সনাতনকে; যাঁর মধ্যে জেগেছে ভগবানের জন্য একটুকু ভালবাসা, সে অনায়াসেই হয় কামজয়ী ঐ।

তস্য এষঃ আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্না;। অয়ম আবসথঃ।
অয়ম আবসথঃ অয়ম আবাসথঃ ইতি।। (ঐ)

জীবের জৈব প্রবণতা বা প্রয়াস দিয়ে মায়া-মোহের শক্তিকে শেষ করা যায় না। মায়ার যোগসূত্র রয়েছে মহামায়ার জগৎ বিলাস আস্পৃহার সঙ্গে তাই জীবকে মায়ের কৃপার আশ্রয়ে ভগবানকে মাতৃরূপে নিজের কাছে আবাহন করতে হবে। ভগবানের সব রূপের মধ্যেই রয়েছে মাতৃরূপের স্পন্দন। এমনকি ভগবান দেবাদিদেব স্বয়ং পরমপুরুষ হয়ে রয়েছেন নির্বিকার নির্বিশেষ নিরাবলম্বন নিঃআশ্রয়ী আবরণ অবস্থান পরিচয় বিহীন সমগ্র সৃষ্টির পরিমণ্ডলে বিরাজমান। তিনি মহানতম পুরুষ। তিনিই সব সৃষ্টির আদি পিতা। অথচ এই দেবাদিদেব মহাদেবই একজন গোটাগুটি মা। তিনি কৃপাময়, দয়া তাঁর স্বভাব। ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব অতি সামান্যতেই তুষ্ট। যেমন তেমন করেই একটি বিল্বপত্রের তিনি উপহার পেয়ে অতিশয় তুষ্ট। জগতের মাঝে তিনিই মহান মহামৃত্যুঞ্জয়ী পরম প্রকাশ। করুণার স্রোত ফল্গুধারায় বয়ে চলেছে তাঁরই মধ্যে। দৈত্য, দানব, রাক্ষস, মানব, মানবেতর সবারই জন্য তাঁর করুণার দ্বার উন্মোচিত। আত্যন্তিকে তিনি পরম এক করুণাদ্র মাতৃচেতন স্বরূপ। সাধন চেতন সাধনের পর্বে পর্বে ভগবানকে নিবেদন করবে স্বতঃই। যেমন করে সাধকের প্রাকৃত রূপটি জগতের প্রকৃতি মায়ের দান অন্ন, জল, বায়ু, আলো, শক্তি— এ সবেরই মিলিত প্রভাবের পথে লালিত হয়ে জীবন রথকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে সম্মুখ পানে। তেমনি আবার ভগবৎ পথের আহ্বান আর স্পন্দনকে বরণ করে নেবার জন্য হয়ে ওঠে যত্নশীল, উদ্গ্রীব। জীবের তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়েই এই চেতনস্পন্দন ফুটে ওঠতে পারে। এমন ক্ষেত্রে ঐ তিনটি অবস্থার মধ্যে এক পারমার্থিক সত্যের আকৃতি জাগিয়ে তুলতে হয়। জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় আত্মারূপী ব্রহ্মচেতন জীবের মনের প্রাণের-হৃদয়ের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ভগবানের জন্য আকূতি—আবেদন, ভালবাসা সত্যি করে মনের মাঝে জেগে উঠলেই সাধকের সাধন চেতন ঐ ব্রহ্মচেতনের সন্ধান–স্পর্শ পেয়ে যান। প্রথম মিলন উভয় চেতনের ঘটে সুষুপ্তিতে হৃদয়ের স্থান অনাহতে। এটি ভগবানের জন্য ভালবাসার ক্ষেত্র। ব্রহ্মপথে নেমে আসা ব্রহ্মচেতন প্রথমে ধরা দেন হৃদয় পদ্ম মাঝে সাধকের ভালবাসা আর নিবেদনের পর্বে।।

—ঃঃ—

ঈশ্বর সান্নিধ্যে

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরই সত্য ঃ ঋষিজীবন সর্বদাই ভগবৎ সান্নিধ্যে হয়েছে যাপন। চিন্তায়, ধ্যানে, কর্মে ভগবান সদাই ঋষির চেতনে হয়েছেন স্থিত। শয়নে-স্বপনে, গৃহকর্মে, জগৎ কর্মে এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের পরম্পরাতেও ঋষি থেকেছেন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। মহাকাশে ব্যাপ্ত ব্যোমহ ঋষির ধ্যানরাজ্যে ভূমার স্তম্ভ হয়ে ফুটে উঠেছে। ঋষি জীবনের এই নিত্য ভাগবতী সংযোগ কখনও সুপ্ত কখনও বা প্রকাশিত। যে মহাসত্য এই সমগ্র সৃষ্টিকে রচনা করে ধারণ করে রয়েছে ঋষিজীবন ঐ সত্যের প্রকাশিত। যে মহাসত্য এই সমগ্র সৃষ্টিকে রচনা করে ধারণ করে রয়েছেন ঋষিজীবন ঐ সত্যের পরম্পরা এগিয়ে নিয়ে চলছেন আবার ঐ সত্যকে ধারণ করে নিয়ে এগিয়েছেন। ঋষি চলেছেন এগিয়ে জগৎপথে সত্যের পতাকা অন্তরে ধারণ করেই। ঋষির জীবনের সত্য ভগবানকে কেন্দ্র করে। এই মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী, মানুষজন, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, নদীজল, মহাসমুদ্র, এই ধরিত্রী, বনাঞ্চল, আকাশ, অন্তরীক্ষ, বায়ু, অগ্নি সবই ভগবানের দান। ঋষির প্রত্যয় অচঞ্চল, দৃঢ় ঋষি জানেন তাঁর চারদিকে যা কিছু হয়ে চলেছে জীবের ইচ্ছার সূত্র ধরে। অথচ এ সবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে জীবের নিজ ইচ্ছার প্রভাব। ভগবৎ ইচ্ছাতেই ঋষি মৌল বীজ হয়ে রয়েছে। অথচ জীবের বাসনা নিষিক্ত ইচ্ছার টানাপোড়েনে ভাগবতী ইচ্ছা ক্রমশঃ যেন সরে দাঁড়ায় জগতের কার্যকারণ থেকে। জীবের নিজ ইচ্ছার এই ক্ষমে ভাগবতী প্রকাশ সুপ্ত থাকে।

তৎ এতৎ সত্যম্ — যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাম্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপা।
তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ।
প্রজায়ন্তে তত্র চ এব অপিযন্তি। (মু. উ. ২/১/১)

জীবের প্রকৃত স্বরূপ নিহিত রয়েছে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ভগবত্তার মধ্যে। সাধারণ অবস্থায় জীবনের মূলে যে ভগবত্তা নিহিত রয়েছে সেটি জীবের স্মরণ হয় না কোনও ভাবে এ বিষয়ে চেতনার সংযোগ ঘটলে জীব তার পার্থিব স্বভাব ও প্রভাবের ডালি দিয়ে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিতে পারে। নিয়ন্ত্রণ অর্থ জীবনের মাঝে মানব স্বভাবকেই জীব ফুটিয়ে তোলে। মানবিক স্বভাবে সৎ-অসৎ; ভাল-মন্দ মিশে থাকে। কখনও অত্যন্ত বিশুদ্ধ নিবিড় সত্য ভাবনা ও সত্য পালনের প্রয়াসে জীব ভাব তন্ময়তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হতে পারে। ধ্যানে-মননে ভগবানকে বরণ করে নিয়ে জীবকে তার জীবন ক্ষেত্রেই ভগবানের মনন-স্মরণ-নিবেদনের পথে এগিয়ে যেতে পারে। সাধন রাজ্যে প্রবেশ করেই জীব অনুধাবন করতে পারে যে শিক্ষামায় অগ্নি যজ্ঞের প্রধান সাক্ষী হয়ে রয়েছেন, তিনিই আবার স্বয়ংই সত্য। তিনি সত্যময় হয়ে সদা বিরাজ করেন এরই মধ্যে।

দিব্যঃ হি অমর্তঃ পুরুষঃ সঃ বাহ্যঃ অভ্যন্তরঃ হি অজঃ।
অপ্রাণঃ হি অমনাঃ শুদ্ধাঃ হি অক্ষরং পরতঃ পরঃ।। (মু. উ. ২/১/২)

ঐ মহান সত্যই হয়েছেন জ্যোতির্ময়। তিনি স্বয়ংই ঐ বিশুদ্ধতার প্রতীক হয়ে এখন শিখামায় অগ্নি হয়ে বিরাজ করবেন সর্বদাই। দেশ সর্বদাই যেন একটি স্থানকে নির্দেশ করে। সাধকের সাধন পথের সব উপাদানই এখন হয়েছে একমুখি। অন্তর মাঝে এখন শুধুই সত্যকে ধারণ করে এগিয়ে চলবে সত্য আহরণের প্রয়াস প্রকৃত মাত্রার হয়ে জীবন-যাপন হয়ে উঠবে। সাধন পথের এই প্রবাহ যেন জগতের অতীত, ভবিষ্যতের ঘটনাবলী ও ধারণাকে সরিয়ে ঘটে হৃদয়ের মাঝে। এই বোধ ও উপায়ে এই গ্রন্থমালার দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে উপলব্ধির স্রোতে।

সাধন পথের গভীরে প্রবেশ করে জানবেন ঐ যজ্ঞের অগ্নিশিখা থেকে ফুটে উঠেছে যে স্ফুলিঙ্গ কখনও কোথাও, এখন হয়েছে তার নিত্য ভাবপথের উপলব্ধি ও উন্মোচন। এই পর্বের মাঝে হয়েছে যে ভাব প্রবাহ তখনই বুঝবেন স্বরূপত ঐক্য। অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ যেমন করে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে স্বাতন্ত্রে, তেমনি আবার ঐ স্বাতন্ত্রের শক্তি যেন বিপরীত এক প্রান্তের দুটি

উপাদান। এমনভাবে এই ডিজাইন যেন মনের মাঝে বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সত্যের অনুপম বোধ। যে সত্য নিহিত রয়েছে অগ্নির মধ্যে তারই তখন প্রকট হবার ক্ষণ ঐ সত্য থেকে সূচনা হবে সব এই সত্যকে নিজের মত করেই আরও নিবিড় উপলব্ধির মধ্য অথবা গভীর ভালবাসার মধ্য দিয়ে সূচিত হবে ভাগবতীই এই প্রয়াসে স্বতঃস্ফূর্তির অথবা নিজ সামর্থে ফুটে উঠবে নিত্য নিরঞ্জন এমন ক্ষণেই আসবেন তিনিই দ্রুত জীবনের প্রদীপ এখন কর্ণে প্রবেশ করবে স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বর সান্নিধ্যে।

ঈশ্বর সান্নিধ্যে ঃ

গন্তারা হি স্থো অবসে হবম্ বিপ্রস্য মাবতঃ।
ধর্তারা চর্ষনীনাম।।
অনুকামং তর্পয়েথাম। ইন্দ্রঃ বরুণঃ রায় আ।
তা বাম নেদিষ্ঠাম ইমহে।। (ঋ. বে. ১/১৭/২-৩)

সাধকের নিবেদনে এসো জাগো সাধন হৃদয়ের নিবেদন ক্ষেত্রে।
তোমার অবস্থানের নিত্য প্রয়াসে ব্রহ্মভাবের মন্থনে এনেছ সত্য।
নিত্য দ্যুতি জীবনের ক্ষেত্রে ক্রমে চলে বেড়ে তোমার সত্য উপস্থিতি।
গভীর থেকে গভীরতর অনুভবে আসুক জীবনে সত্যের পরম দ্যুতি।
এসেছিল বাসনা জীবনে যদি কভু করিতে তোমায় বরণ অনুভবে।
জেগেছে সাধন প্রেরণা করতে পূরণ অনুভবের বাসনা রাজি।
দেবতারে করে বরণ ইন্দ্র, বরুণ রূপ নিকেতনে অরূপের নিত্য আবাহনে।
তাই তো তোমায় করি স্মরণ বাসনার দিব্য স্ফুরণে জগতের ক্ষেত্রে।

দেবতার ইচ্ছায় ঃ

যুবাক্কু হি শচীনাম। যুবাক্কু সুমতীনাম্।
ভূয়াম বাজদাব্রাম্।।
ইন্দ্রঃ সহস্র দাব্রাঃ বরুণঃ শংস্যানাম।
ক্রতুঃ ভবতি উক্থ্।। (ঋ. বে. ১/১৭/৪-৫)

চিন্তার শক্তি কর্মের শান্তি নিয়ে চল এগিয়ে অফুরন্ত জীবন শক্তি নিয়ে।
নিত্য প্রয়োগ প্রাপ্তি তোমার তরে বিজয়ী হয়ে জগতের বুকে।
দাও হে দেবতা তোমার অনুভব। তোমার দাতা পরিচয়কে করে অতিক্রম।
চলি এগিয়ে করতে নিশ্চয় তোমার পরিচয়।।
সহস্র দেব পরিচয়ের অন্বয়ে খুঁজেছি দেবতার দাতা পরিচয়কে।
দেবতার দানে হয়েছে জীবনের অন্বয়ে গ্রথিত সাধন গতির।
তীব্রতায় এসেছে জগতের বুকে সহস্র প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভাগবতী উষা।
শুনেছে কর্ণে আকুতি জীবের হয়েছে হৃদয়ের ক্রম উন্মোচন।।

সাধন বিজয়ে ঃ

তয়োরিৎ অবসা বয়ং। সনেম নি চ ধীমহি।
স্যাদ্ উত প্ররেচনম্।।
ইন্দ্রঃ বরুণঃ বাম অহম্। হুবে চিত্রায় রাধসে।
অস্মান্ সুঃ জিগ্যুম্ কৃতম্।। (ঋ. বে. ১/১৭/৬-৭)

তোমাদের দেব উপস্থিতির সংবেদ এনেছে জীবনে কৃপার পরশ।
সম্পদ আর সামর্থের প্রবাহ চলেছে বেড়ে ভাগবতী পথে।
করেছি তোমায় বরণ ধ্যানপথে। তোমায় করে বরণ হয়েছি সাধন পথিক।
করিছে তোমায় নিয়ে আহ্বানে করি বরণ জীবন কর্মে দেবতার সংবেদ।
তোমার প্রেরণায় হয়েছে এখন দিব্য পথের আবরণ করে উন্মোচন।

চলেছি এগিয়ে নিয়ে সাথে জগৎ জনের হৃদয় মানসে।।
উঠুক জেগে তোমার অভীপ্সা আর প্রেরণার ধারণে।
জীবন যজ্ঞের ক্রম পর্বে করেছি বরণ তোমায় জীবনে।।

যজ্ঞে নিবেদন ঃ ইন্দ্রঃ বরুণঃ নু নু বাং সিষান্তিষ ধীষু আ।
অস্মভ্যং শর্ম গচ্ছতম্।
প্র বাম অগ্নতু সুষ্টুতিঃ ইন্দ্রঃ বরুণঃ যমঃ হুবে।
যাম ঋধতে সধা স্তুতিম। (ঋ. বে. ১/১৭/৮)

চিন্তায় অভিযানে এসেছি তোমার অঙ্গনে মানব চিন্তার ধারা করে অনুসরণ।
তোমার এই অনন্ত প্রকাশের গভীরে এসেছে দিব্য চিন্তার বহর।
ইন্দ্রঃ বরুণঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে এসেছে দিতে এগিয়ে ভাগবতী ভাবধারায়।
দিয়েছো জীবন মাঝে প্রভূত জগদানন্দ জগৎ ব্যাপারেই জীবনে।
মানবের এই সমগ্রতার সাধনে বহুজনের এখন হবে নিত্য স্থিতি।
তোমার কৃপার অকৃপণ দানে গিয়েছে ভরে সকল গ্রহণ পাত্র
ইন্দ্রাদি বরুণ যম প্রভৃতি পরিচয়ে দিয়েছ এগিয়ে অনন্ত সম্ভাবনারে।
তোমায় করি বরণ এমনই পটভূমিতে অনন্ত সাধন পর্বেরই মাঝে।।

ঋষি সত্যার্থী ঃ ঋষিজীবন সর্বদাই ঈশ্বর সান্নিধ্যে এগিয়ে চলে। ঋষি হলেন সেই মানুষ যে ঈশ্বর ভাব ও বোধ দ্বারা জারিত মনে প্রাণে হৃদয়ে; ঈশ্বর অভিমুখি সদাই। ঋষিজীবনের মধ্যে লোভ, বাসনা-কামনা ইত্যাদির সুযোগ নেই। মন ঐসব আকর্ষণ থেকে মুক্ত। দৃঢ় প্রত্যয় ঈশ্বর এই ঋষিজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঋষির জীবন মাঝে প্রাণের আকৃতি গড়ে ওঠে ভগবানকেই কেন্দ্র করে। ঋষির জীবন কর্মের ও ধ্যানের সমন্বয়। জগৎকর্ম, জীবন কর্ম সবই সেখানে হয়ে থাকে নিত্য প্রকাশের ও নিত্য চর্যার ক্ষেত্র। প্রকাশ ক্ষেত্রটি ঋষির নিজের সাধন ও যজ্ঞ পথে অর্জন করা সত্যের উপর। যজ্ঞ হয়ে রয়েছে নিহিত যা কিছু সাধন প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে থাকে। এই নিত্য প্রকাশের স্বতঃ নিবেদন যজ্ঞের প্রসার ও যজ্ঞ প্রভায় হয়ে উঠবে স্বতঃ নিবদ্ধ। যা কিছু কর্ম এই ঋষিজীবন করে থাকেন সবেরই মধ্যে ফুটে ওঠে একান্ত প্রকাশের এই ক্ষণ। যে ক্ষণের এই নিত্য প্রদীপ হয়ে ওঠে আলোর পথে তারই রয়েছে প্রজ্ঞার পরশ জাগরণের এই ক্ষণের প্রবাহে।

এতস্মাৎ জায়তেঃ প্রাণ, মনঃ সর্ব ইন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ুং জ্যোতিঃ অপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।। (মু. উ. ২/১/৩)

ঋষির ধ্যান নিবেদিত ছিল অদ্বৈত ব্রহ্মের অনির্বচনীয় রূপেই প্রধানত। সাধারণত হয়ে উঠতে শূন্য মহাকাশের ধ্যানে নিযুক্ত হয়ে থাকার মধ্যেই। এই অদ্বৈত ভাবের মৌল সূত্র হয়ে থাকে ঋষির ধ্যানচেতনে ঐ মহাবেহ্যাম, মহাশূন্য। আবার অনন্ত বিস্তৃত মহাসমুদ্রের জলরাশি একদিকে আবার অনন্ত বিস্তৃত ঐ সর্বত্র ব্যাপ্ত মহাপ্রাণ বায়ুরূপে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। আবার এই অসীম অনন্ত আলোর প্রবাহ স্বতঃই হয়ে উঠেছে নিত্য নিরঞ্জন ব্রহ্ম সনাতনের জগৎ প্রদীপ হয়ে। এই জগৎ মাঝে সদাই হয়েছে সবই বিস্তার নিত্য প্রবাহে। ঋষির এই প্রতিদিনের জীবন পরিগ্রহের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে জগৎ মাঝে যে বিকশিত হওয়া জ্ঞানপ্রদীপ জীবনের মাঝে হয়ে চলেছে প্রতিভাত। এই ভাবপ্রদীপই হয়ে চলে ঋষির চলমান এই জীবন পর্বের মাঝে মহিমাদীপ্ত এক প্রকাশ প্রদীপ। ঋষির প্রত্যয় এই জীবনেই নিহিত।

জীবনের কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান সবই ভগবানে নিহিত হয়ে রয়েছে সদা সর্বদা, প্রতিক্ষণে, প্রতিদিনে। ঋষির জীবন যাপিত হয়েছে সর্বদাই ভগবানে নিবেদিত। ভগবানের কাছে নিবেদনই প্রতিটি কাজের মৌল অংশ। জীবনের পরিগ্রহের জন্য ঋষির ছিল নিত্য কর্ম। কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনের সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য উপার্জন ঋষিজীবনের ছিল নিত্য প্রয়াস। অথচ সকল জগৎ কর্মের প্রয়াসই ভগবানে ছিল নিহিত। ভগবৎ প্রসাদেই হয়েছে ঋষির জীবন মাঝে কর্মের ও দায়িত্ব মেটাবার জন্য প্রাকৃত কর্মের সংস্থান করে নেওয়া ছিল স্বাভাবিক। ঋষির ধ্যানময় জীবন যখনই কর্মের মাঝে করতো প্রবেশ, হয়ে উঠত তাদের এই জগতের শ্রীময় অধ্যায়।

অগ্নিঃ মুর্ধাঃ চক্ষুষী চন্দ্র সূরয়ঃ
দিশঃ শ্রোত্রে বাক বিবৃতাঃ চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণঃ হৃদয়ম্ বিশ্বম অস্য
পদভ্যাং পৃথিবীঃ হি এষ; সর্বভূত অন্তঃ আত্মা। (মু. উ. ২/১/৪)

এখন ঋষির এই ধ্যানপথে হয়েছে যে নিত্য আশ্রয়। কর্মের পথে ঐ ধ্যান প্রয়াস হয়ে ওঠে অপরূপ জাগরণী। কর্মের প্রবাহ পথে হয়েছে জীবনময় ব্রহ্ম সাধন। ঋষির ধ্যানপথে মূর্ত হয়ে রয়েছে সর্বদাই এক অনন্যতা যার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে জীবনের জাগরণের অধ্যায়। ঐ পরম পুরুষই সমগ্রতায় হয়ে রয়েছেন ব্যাপ্ত জগৎ ময়। পরম পুরুষ তিনি এই অগ্নি, বায়ু, আলো, পৃথিবী, প্রকৃতি সবেরই এক সমাহার নিয়েই হয়ে রয়েছেন ব্যাপ্ত। নিরাকার নিরঞ্জন তিনি একেকটি রূপে জগৎময় প্রতিভাত।

ব্রহ্ম সনাতনই পরম পুরুষরূপে সর্বত্র ফুটে উঠেছেন। তাঁরই নিজ দৃষ্টির অনির্বচনীয় রূপ প্রভায় সর্বজীবের ক্ষেত্রে হয়ে রয়েছেন ব্যাপ্ত। এই ব্যাপ্তি জীবনের সব প্রকাশকে স্পর্শ করে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে নিত্য দিনের নিত্য প্রকাশে। এই নিত্য প্রকাশের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে জীবন প্রকাশের জন্য স্বতঃ প্রকাশী এক অনন্ত সত্ত্বা। এই অনন্ত প্রকাশই ঐ মহাপ্রাণেরই বিপুল সত্যের জগৎ প্রকাশ। এই জগৎ প্রকাশ অনন্ত রূপে। যত সব জীবনের ফুটে ওঠা দৃষ্টি রয়েছে বিরাজিত ঐ বিকাশ হয়ে উঠবে জীবন মাঝে অনন্ত সত্যের মহাপ্রকাশ। মহাপ্রকাশ রূপে রূপে; প্রতিরূপে বিভাসিত। এই অনন্ত বিকাশের মধ্যে থাকে নিহিত সত্যের মহৎ বিকাশ সূত্র। আবার প্রতিটি জীবনের মাঝে ফুটে উঠেছে মহাসত্যের পরশে মহাপ্রাণের প্রাণপ্রদীপ। এই প্রাণপ্রদীপই জীবনের আলো। মহাপ্রাণ যখনই ঐ প্রাণপ্রদীপকে আবার ফিরিয়ে নেবেন হয়ে উঠবে প্রাণ থেমে যাওয়া।

মহান ঐ প্রকাশই জীবনের পথপ্রকাশী হয়ে উঠেছে সব চেতনেরই নিত্য দিনের নিত্য প্রকাশ হয়ে চলবে জীবন পথে। হৃদয় মাঝে এই সত্যকে ধারণ করেই এগিয়েছে ঋষির জীবন-যাপন। যখনই এসেছে নবীন সত্যের ভাব উন্মোচন হয়েছে তারই হবে জীবন মাঝে মহাসত্যের জীবন প্রকাশ। মহাসত্য জীবনের সত্য হয়েই জীবন পথে এগিয়ে চলবে স্বতঃ; প্রকাশের নবীন আবহে। ভূমির উপরই গড়ে উঠেছে সব জীবনেরই গড়ে ওঠা আর এগিয়ে চলা।। যেমন করেই হয়েছে প্রতিদিনের প্রকাশ পর্বের সমারোহ অনুভবের ব্যাপ্তিতে তেমনই সব জীবনের মধ্যেই রয়েছে যে ভাগবতী প্রকাশ তারই স্বতঃ বিকাশ।

দিব্য আলোক ব্রহ্মভাব মিলন ঃ

সোমানং স্মরনং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষিবন্তং যঃ ঔষিজঃ।।
যে রেবান্ যো অমিবহা বসুবিৎ পুষ্টি বর্ধনম্।
সঃ নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ।। (ঋ. বে. ১০/১৮/১-২)

তোমার সাধন পথে জেগেছে প্রাণের স্পন্দন নতুন সংবেদে।
তোমায় করতে স্মরণ নিয়ত জীবনের চলার ছন্দে দেব অভীপ্সায়।
সাধন স্রোতের এক মন্ত্রের নিবেদনে করেছি বরণ, ব্রহ্মপথের অভিসারে।
আলোয় জাত এ প্রাণ করেছে সন্ধান আলোর উৎসে আলোর দেবতারে।
কালের প্রবাহে হয়েছে অতীত মন্থন তোমার স্পন্দন জীবনের স্পন্দনে।
অস্ফুট প্রকাশের দীপ্তি জীবনের এই চলার পথের সাধন প্রকাশ
নিত্য আলোয় হয়ে চমকিত জীবনের নিত্য সংবেদের মহিমায়।
এখন এসেছে ক্ষণ মিলনের ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম স্পর্শের উজ্জীবনে।।

তুমিই নবীন পথের পরম গতি ঃ

মা নঃ শঃ সৌ অরুরুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ মতস্য।
রক্ষা নো ব্রহ্মনস্পতে।
স খা বীরো ন রিষ্যতি যম ইন্দ্রঃ ব্রহ্মণস্পতেঃ।
সোমঃ হিনতি মর্তম্।। (ঋ.বে. ১/১৮/৩-৪)

তোমায় হয়ে রত সকল ভাবনার বীজ তত্ত্ব নিহিত ছিল যতই হয়ে ব্যাপ্ত
এখন ঐ পথের ভাবপ্রদীপ দিয়েছে জীবন মাঝে ব্যাপ্ত প্রত্যয়।
নিত্য বিকাশের এই পথ হয়েছে দিব্য প্রবাহ পর্বের একান্ত বিকাশ।
এখন এসেছে সময় তোমারই জীবন প্রদীপ করে আলোক প্রভায় স্নাত
যে ভাবপথ তোমারই বিকাশে হয়েছে স্থিত এখন এসেছে আহ্বান তারই
তোমায় করেছে বরণ যে প্রাণ পেয়েছে স্পন্দন মায়ের আশ্রয়ের দীপ্তি।
অক্ষয় এই দিব্য তনুর এখন শুদ্ধ প্রকাশ জগতের জ্ঞান বিকাশে।
সাধন পথের এই আহ্বানে হও জাগ্রত জীব হৃদয়ের তপস্যার এই স্রোতে।।

প্রজ্ঞাপথে উপলব্ধির বাঁধন ঃ ত্বং তং ব্রহ্মণ্পতে সোম ইন্দ্রস্য চ মর্তম্।
দক্ষিণা পাতু অংহস।
সদস্পতি অদ্ভূতম প্রিয়ম্ ইন্দ্রস্য কামতম
সনিম মেধাম্ অ্যায়াষিষম।। (ঋ. বে. ১/১৮/৫-৬)

দেবগণের কৃপার আনুকূল্যে হয়েছে সাধন প্রাবল্যে নিত্য সঞ্চয়।
তোমায় করে আহ্বন সাধনের এই যজ্ঞ নিবেদন পথে
এখন চলেছে দিব্য চেতনের জীবন বিস্তৃত এই প্রবাহ পর্বে।
প্রাণের সামর্থ সদাসৎ বিচারে হয়েছে এখন স্থির শক্তির উন্মেষ।
নিত্য সত্যের অভিযানে চলেছি এখন এগিয়ে সাধনের বিজয় রথে।
তোমায় চিনতে তোমায় বুঝতে করেছি তোমারই চিত্রণ হৃদয়ের গভীরে।
নতুন জীবনের আহ্বান করে সঞ্চয় চলেছি এগিয়ে তোমারই দিকে।
বুঝেছি তোমার ছন্দের গরিমা জীবনের এই মিলন আহ্বানে।।

সাধন রথে চিন্তার ঐক্যে ঃ যস্মাৎ ঋতে ন সিধ্যতি যজ্ঞঃ বিপশ্চিতঃ চন।
সঃ ধীনাং যোগমৎ ইন্বতি।
আতো ঋধ্নোতিঃ হবিঃ কৃত্রিম, প্রাজ্ঞম কৃনোতি।
হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি।। (ঋ. বে ১/১৮/৭-৮)

মায়ের অনুভবের রেশ ধরে চল এগিয়ে সাধন পথে।
সত্যকে করে অবলম্বন চল এগিয়ে জীবন পথের প্রবাহে।
ভাগবতী দীপশিখার হোক লালন প্রদীপ্ত আলোয় হয়ে ভাস্বর।
অনুভবের এই অন্বয় প্রাবল্য দিয়েছে চিন্তার একত্ব সাধনে।
এই অনুভবের প্রবাহ পথ গূঢ় সংবেদে সাধন পথে।
ভগবানে করে বরণ চল এগিয়ে এই ব্রহ্মসাধন পর্বে।
অন্তরে বাইরে উর্ধ্বে অধে সর্বত্র রয়েছে তাঁরই উদার স্পর্শে।
এই মন্ত্রের নিবেদন ছিল জীবন রথের শক্তি তোমারই অভিমুখ গতিতে।।

ঋষি নিবেদিত ঃ ভগবৎ সাধনের সব ধারা ও উপধারার মধ্যে রয়েছে নানা উপাদান। অদ্বৈত বেদান্তের সাধন নিরাকার ব্রহ্মের সাধন। ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার। নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, শুন্যে মহাশুন্যের মাঝে মহাব্যোমেই নিহিত তাঁর পরিচয়ের স্ফুলিঙ্গ। মহৎ তিনি, পরম তিনি, সর্বব্যাপ্ত তিনি। আবার তিনিই কালাতীত নিত্য সনাতন। তিনি কোনও নির্দিষ্ট কালের পটে আবদ্ধ নন। যেমন বায়ু সর্ব ব্যাপ্ত। অথচ বায়ুর খোঁজ পেতে হয় তাঁর প্রভাব ও বিকাশ থেকে। বায়ুর বিশেষ পরিচয় ফুটে ওঠে যখন বায়ুর দ্বারা প্রাণের প্রদীপ হয়ে চলেছে দীপ্যমান। পঞ্চবায়ুর প্রভায় জীবনের বিশেষ জাগরণ ফুটে ওঠে। পঞ্চবায়ু স্বতঃই হয়ে চলেছে জীবের অভ্যন্তরে দীপ্যমান অঙ্গে

অঙ্গে। এমন করেই সব অঙ্গে এই পঞ্চবায়ুর প্রভাব ফুটে ওঠে জীবনের চলমান সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে বায়ুর প্রবাহকে পরোক্ষ উপায়ে বোঝা যায়। যখন অন্তরে বায়ুর প্রভাব নিজের অনুভবে ফুটে ওঠে তখনই প্রকৃতভাবে বায়ুকে বোঝা যায়।

তস্মাৎ অগ্নিঃ সমিধো যস্য সূরয়ঃ
সোস্মাৎ পর্জন্য ঔষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।।
পুমাত্ রেতঃ সিঞ্চাত যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূত্ভ্যাং।। (মু উ. ২/১/৫)

তিনি বায়ু স্বরূপ হয়ে সর্বত্র সর্বপ্রাণে বিরাজিত। তিনি বায়ুর একটি অনুভবের সঙ্গে যেমন স্মরণে ফুটে ওঠে প্রাণের পরশ; তেমনই ভগবানের উপলব্ধির কিঞ্চিত মাত্রা থেকেই ফুটে ওঠে ভাগবতী পরশ। ভগবৎ প্রকাশটি আত্যন্তিক। অন্তর মাঝে এই প্রকাশ ফুটে ওঠ নিত্য প্রবাহ পর্বে সদাই এক অনন্ত ভাবদীপ্তিতে। এই ভাবদীপ্তি অনুভবের একেকটি বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। ব্রহ্মপথের সাধন অনুভব ক্রমে সঞ্চারিত হয়। এটি স্বতঃই জীবের চেতনস্তরের সঙ্গেই সমাঙ্কিত। ব্রহ্মপথের এই সাধন অনুভব একটু একটু করেই সাধারণত হয় প্রসারিত। কখনও আবার দমকা হাওয়ায় একবারেই যেন অনুভব ফুটে ওঠে। এই অনুভবের সঙ্গেই হয়ে ওঠে সাধকের নিজ অবস্থান পরিবর্তন বা রূপান্তর। অনুভবের প্রবাহ যত গভীর হয়ে উঠবে সাধক জীবন ততই ভাগবতী চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠবে। সাধক জীবন এমন ক্ষণে হয়ে ওঠে আরও গভীরভাবে ভগবৎ পথের জন্য আগ্রহী। চেতনার উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রে, ব্যবহারে, জীবনের আকৃতি ও জীবন পথের জন্য নবীন দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ ঘটে যায়। সাধক জীবন এখন নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমে ভগবানের অভিমুখে এগিয়ে যেতে তৎপর হয়। সাধকের এখন নবীন দৃষ্টি ও চেতনের আচ্ছাদনে ক্রম সঞ্চারে এগিয়ে চলবার ক্ষণ। এমনকি জীবনের সব মানবিক জৈব বৃত্তিও হয় রূপান্তরিত।

তস্মাৎ ঋচঃ সমঃ যজুংষি দীক্ষা
যজ্ঞঃ চ সর্বেঃ ক্রুততো দষিণাঃ চ।
সংবৎসরঃ চ উজস্মানঃ চ
লোকাঃ সোমো যত্র পরতে বহু সূর্য।। (মু. উ. ২/১/৬)

ঋষিগণের জীবন ধারণ সর্বদাই স্বর্গীয়। ঋষির চেতন প্রদীপ শুধুই ভগবানকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে যায় বা যেতে চায়। নিজের চাওয়া পাওয়া; বাসনা-কামনার সবটাই যেন মুছে যায় নিজ বৃত্তেই। আর সবকিছু তার মধ্যে থেকে যায় যেন জীবনের অনিবার্যতা ব্যতিরেকে এক নিগূঢ় স্বাতন্ত্র। ভগবানই হয়ে ওঠে জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ক্রমে একটি সময় ফুটে উঠবে যখন আর ভগবান প্রধান নন, একমাত্র প্রিয়-আপনজন হয়ে উঠবেন। এই ক্ষণটি সাধকের কাছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ক্ষণ। ভগবানকে বুকে ধারণ করে সাধক এখন হয়ে উঠবেন জগৎ মাঝে এক অনিবার্য ভাগবতী আলোক প্রদীপ। এই আলোক সাধক জীবনের বাহ্য পরিচয়ে ব্যাপ্ত হয়ে হবেন বিরাজমান। আবার আলোর ধারায় সাধক জীবন সদাই হবে স্নাত। এই আলো বিশুদ্ধতার প্রবাহ নিয়ে আসে মনের মাঝে, রয়েছে যে উপাদানসমূহ সে সবই বিশুদ্ধতায় হয়ে বিধৃত হবে পূর্ণতার অভিলাষী। ভগবান লাভ এই ক্ষণে হয়ে ওঠে উপলব্ধির বিষয়। নিজস্ব উপলব্ধির স্রোতে স্নাত হয়ে সাধন জীবন স্বতঃই হয়ে উঠবে একান্ত নিবিড় আকাঙ্ক্ষী। এমন করেই তার আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠবে নিত্য বিষয়ীভূত। অর্থাৎ আহার-নিদ্রা-স্বপন-বিষয় কর্ম-জগৎ পরিচয় সম্পর্ক এ সবই এমন ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে নিজস্ব অভিপ্রেত। সর্বাবস্থায় ভগবানকে স্মরণে রাখা গভীর বিষয়। সর্বদা স্মরণে রাখবার চিন্তা যখন হয়ে ওঠে জীবনের অভিপ্রেত, ক্রম বিকাশে এই অভিপ্রায় জগতের বিষয়াদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মবিষয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। মানব চরিত ক্রম বিন্যাসে এই পর্যায়ে ভাগবতী চরিত্র বরণের অভিপ্রায় যুক্ত হয়ে ওঠে।

ভগবান স্বয়ং নিত্য নিরঞ্জন সদাই তিনি জীবনের মাঝে আবির্ভূত হয়ে জীবনকে নিত্য পথে করবেন লালন। এমন লালন পর্ব সর্বদাই জীবনের জড় সীমাকে অতিক্রম করে চলবে এগিয়ে সাধনের পূর্ণ প্রভায় বরণ করবার প্রয়াসে। জীবনের এই পর্বে হয়ে উঠেছে এক সনাতন সত্যের প্রয়াসী প্রাণ তার স্ফুরণের এই প্রবাহে অনন্তের নিত্য সত্য সাধন জীবনের মধ্যে প্রবল শক্তির ধ্যানে মহিমায় হয়েছে নিত্য দিনের এক উন্মোচনী। এই উন্মোচন জীবনকে গড়ে দেবে সুদূরের ঐ প্রজ্ঞা-প্রদীপ আর আলোর দীপ্ত দীপভূমিতে। সত্যের উন্মোচনের পর্ব যেমন করে সূচনা হয়, তেমন করেই গড়ে এরই ব্যাপ্ত রূপ। অন্তরের সুপ্ত সত্য এখন হবে জগৎমাঝে প্রকাশবান।

দেখেছি তোমায় অন্তরে ঃ নরাশংসং সুধৃষ্টম্ ইম।
অপশয়ং সপ্রথ হস্তম ইম।
দিব্যো ন সদ্ম মঘবন্।। (ঋ. বে. ১/১৮/৯)
দেবতা তোমায় দেখেছি অন্তর মাঝে
তোমারই কৃপার পরশে দেখেছি তোমায় গভীর অভ্যন্তরে।
মনের মাঝে চিন্তার গভীরে পেয়েছি তোমার স্পর্শ
হয়েছি তোমারই সাথী তোমারই কৃপায় সাধন পথে।
জগতের বাধার প্রাচীর হয়েছে অতিক্রম তোমার আহ্বানে।
চিন্তার জগতে চলতে এগিয়ে পেয়েছি প্রেরণার শক্তি
করতে বরণ আছে যত প্রাণ নিবেদনের আগ্রহ প্রতীক্ষায়।
এসেছে মনের মাঝে অমৃত স্পর্শ তোমারই উপলব্ধির স্রোতে।।

বরণ কর দিব্য আলোক ঃ প্রতি ত্বং চারুম্ অধ্বরম।
গো পীথায় প্র হৃদয়ে।
মরুৎ ভিঃ অগ্ন আ গছি।। (ঋ. বে. ১/১৯/১)
যজ্ঞের নিবেদনে এসেছে আলোর আহ্বান।
সাধন যজ্ঞে দেবতার তরে হোক সত্য নিবেদন।
জীবন পথে কর চয়ন দেবতার ঐ আলোক।
এখন হোক সংহত নিবেদনে দেবতার তরে সমর্পণের ভক্তি প্রভা।
ঐ অনন্ত ভাব সম্পদ হোক উন্মোচন নিত্য পরশ প্রতীক।
দেবতার ইচ্ছায় হয়ে স্নাত কর বরণ দেবতারে।
অগ্নি দেবতায় করে বরণ মরুৎ হয়েছে এখন উন্মোচন।
এসেছেন এই দেব প্রভা নিয়ে শিখাময় অগ্নি।

ভাগবতী ইচ্ছায় হয়ে স্নাত ঃ ন হি দেবো ন মর্তঃ।
মহিঃ তব ঐতুম পরঃ সত্যাৎ আদিষ্ট।
মরুৎ ভিঃ অগ্ন আ গাহি।। (ঋ. বে. ১/১৯/২)
দেবতার অভীপ্সায় এ সাধন ক্ষেত্র দিয়েছে বিজয় স্পর্শ
যখনই এসেছে দেবতার বার্তা করে গ্রহণ নিত্য অনিবার্যতায়।
এখন হয়েছে ঐ বিকাশের পূর্ণ দীপ্তি প্রবল প্রকাশের মাধুর্যে
যে ভাব প্রভাহ এসেছ জীবনের এই সাধনে হোক তারই চেতন উন্মেষ।
ঐ অনন্ত বিকাশের দিব্য আলোক রাশি এখন জীবন মাঝে আহৃত।
এসেছে এখন নিত্য প্রকাশের এই সাধন অভীপ্সার বিকাশ ক্ষণ।
অগ্নি-মরুতের যৌথ আবাহন এখন এনেছে সাধন প্রাণের শক্তির ক্ষেত্র।
পরম নিবেদনের বিমূর্ত স্পন্দন এখন হয়েছে স্থিত জীবনের মাঝে
দেবতার তরে দেবতার বরে হয়েছে প্রস্তুত ক্ষণ তোমায় নিবেদনে।

অন্তরীক্ষের আলোয় ঃ যে মহঃ রাজসঃ বিদুঃ।
বিশ্বে দেবাসঃ অদ্রুহ।
মরুৎ ভিঃ অগ্নে আ গাহি।। (ঋ. বে. ১/১৯/৩)

দেবতারে কর নির্ভর জীবন যাত্রার পথে।
হোক দেবতার কৃপার বর্ষণ নিবেদিত প্রাণের গভীরে।
সাধন মার্গ হয়েছে এখন বিজয়ের অভিমুখি।
সব বাধার প্রাবল্য করে অতিক্রম জগৎ পরিবেশের।
বিশ্বের মাঝে এসেছে যত বাধার সূত্র
হয়েছে যা কিছু বন্ধন করতে ছিন্ন জীবনের সব বন্ধন।
মুক্ত হয়েছে সাধন চেতন জগতের এই কর্ম পরিচয়ে
ঐ ভাবনা হয়েছে যুক্ত এখন দিব্য চেতন সঙ্গে।।

হও ভগবৎ চরণাশ্রিত ঃ পরমপুরুষ স্বতঃই রূপবান। মানবের অনুভবের দীপ্তিতে ফুটে ওঠে সেই সব বিষয় যার কোনওটিই হয়ে ওঠেনি ব্রহ্ম বিষয় ব্যতিরেকে। তিনিই সর্বব্যাপ্ত। আবার সেই তিনিই হয়ে উঠবেন কোনও বিশেষ পরিচয়ের মাত্রায় ঘনীভূত। তিনি নিত্য নিরঞ্জন; আবার তিনিই কালের আবর্তে হয়ে রয়েছেন আবৃত। সময়ের দড়িতে নিজে বাধা পড়েন নিজেরই মহিমার আস্বাদনের পরিমণ্ডলে। তিনিই কালের মাঝে হয়ে রয়েছেন কালের নিয়ন্তা।

উৎগীতম এতৎ পরমং তু ব্রহ্ম
তস্মিন্ ত্রয়ম্ সুপ্রতিষ্ঠিতা অক্ষরম্ চ।
অত্র আন্তরম্ ব্রহ্মবিদঃ বিদিত্ব
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরাঃ যোনিমুক্তাঃ ।। (শ্বে. উ. ১/৭)

বুঝতে হলে চাই মনের বিনিয়োগ। মনকে ভগবানের চরণে নিবদ্ধ করতে হয়। পরম তিনি। স্বতঃই ভগবত্তায় পরিপূর্ণভাবে জারিত হয়ে থাকতে হবে। এ বিপুল বিশ্ব প্রকাশের মধ্যে এক অনবদ্য প্রবণতায় ফুটে ওঠে ভাগবতী প্রসাদ। ভগবান স্বতঃই মধুরতম। তিনি সুন্দর; অতি সুন্দর। তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব সুন্দর। দেহসৌষ্ঠব সুন্দরং বাক সুন্দর; তিনিই সুন্দরতম। সাধকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে হবে ভগবৎ চরণে। তাঁর চরণই শ্রীচরণ। অতি সুন্দর। ভগবানের চরণই তাঁর সুন্দরতম প্রকাশ। সাধকের মন একাগ্রতায় নিবদ্ধ হবে ঐ শ্রীচরণে। তাঁর চরণেই জগতের আশ্রয়। মানব সমাজ যখন অনুধাবন করবে ঐ শ্রীচরণ; আশ্রয় নিয়ে নেবে ঐ চরণের দীপ্তির অঙ্গনে। ভগবানের এই প্রকাশই জগতের জন্য তাঁর উপহার। ঐ শ্রীচরণই পরম পদ। এই পরম পদের আশ্রয়েই গড়ে ওঠে নিত্য নিরঞ্জনের অনন্ত প্রকাশ দীপ্তি। ঐ চরণেরই আশ্রয় নিয়েছে যে প্রাণ তারই মুক্তির দ্বার হয়ে যায় উন্মোচন। এই মুক্তিই মহামুক্তির পথকে করে দেয় উন্মোচন। মনের মাঝে হয়ে ওঠে যে নিত্য প্রকাশ দীপ্তি তারই এখন ক্ষণ জীবন মাঝে স্বতঃ উন্মোচনের। ভগবৎ মনন কীর্তনের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে তার জীবন প্রজ্ঞাকে বরণ করে নেওয়া।

সংযুক্তম এতৎ ক্ষরম চ অক্ষরম্ চ
ব্যাক্তং বক্ত্যাক্তং ভরতে বিশ্বম ঈশঃ।
অনীশঃ ঈশঃ আত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।। (শ্বে. উ. ১/৮)

এমন ক্ষণ চেতনায় দীপ্ত হয়ে যায় যে জীবন মাঝে হয়ে উঠবে ভগবত্তার পূর্ণ দীপ্তি ভাস্বর। এই দীপ্তির আভা জীবনের সার্বিক বিকাশের সব সূত্রকে অতিক্রম করে পরম প্রকাশ হয়ে ওঠে স্বতঃ বিকাশী। ভগবানই জীবনের মৌল শক্তি। তিনিই একদিকে অনির্বচনীয় হয়ে বিকশিত, স্পর্শ দিয়ে চলেছেন সব প্রাণ আর জীবনকে। তিনি স্বতঃই হয়ে চলেন নিত্য প্রকাশী। এই নিত্য প্রকাশই জীবন পথের স্বতঃ উন্মোচনী। যে প্রকাশ ঐ মহাসত্যকে জীবনে জীবনে ফুটিয়ে তোলে তারই বীজ-প্রেরণা দীপ্তিময় হয়েছে ঐ প্রকাশের মধ্যে। নিত্য প্রকাশী তিনি অনন্ত ভাব পথের কাল নিয়ন্ত্রিত জীবন যাত্রায় দিয়েছেন চেতনার গূঢ় স্পর্শ। হৃদয়চেতন দ্বার উন্মোচন হয়ে যায় ঐ চরণ কমল দর্শনে মননে-অনুধ্যানে জীবন ব্যাপ্ত স্বতঃই।

অজ্ঞৌ হি এব জীব ঈশ-অনীশৌ
অজঃ হি একা ভোক্তৃ ভোগ্যার্থ যুক্তাঃ।

অনন্ত চ আত্মাঃ বিশ্বরূপঃ হি অকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মণ এতৎ।। (শ্বে. উ. ১/৯)

অনুভবের পথেই তাঁকে পাওয়া যায়। উপলব্ধির পথ ধরেই এগিয়ে চলতে হয়। উপলব্ধির পথেই পাওয়া যায় ঐ মহসত্য। তাঁকে পাওয়ার একটি পথ হল তাঁর প্রজ্ঞা অর্জন করা। ব্রহ্ম প্রজ্ঞা ব্রহ্মেরই পরিচয়। তিনি বিস্তৃত হয়ে রয়েছেন রূপে রূপে সব রূপে সদাই প্রাণে অপ্রাণে সর্বত্র তাঁরই উপস্থিতি বিরাজমান। প্রাণের মাঝে যে বিস্তৃতি তারই হয়ে উঠেছে নিত্য দিনের জন্য প্রকাশ স্বরূপ। প্রতিদিনের জীবন চলার সত্য আমাদের এই পরম্পরার অধরার মধ্যেই হয়ে থাকে ধরা। জীবনের সব অঙ্গেই ফুটে ওঠে জীবন সত্যের ক্রমপ্রকাশ। এমন করেই জীবনের সব সত্যকে বরণ করে নিয়ে এই সব বাহ্য পরিচয়ের মধ্য থেকে ফুটে ওঠে নিত্য দিনে জীবন সত্য। এই জীবন সত্যের মধ্যেও হয়েছে নিহিত ব্রহ্মসত্য। ব্রহ্ম সনাতন রূপে বিরাজ করেন ভগবানের বিভিন্ন পরিচয়ে আবার রয়েছেন ব্যাপ্ত সর্বত্র।

ক্ষরম্ প্রধানম্ অমৃতঃ অক্ষরম হরঃ
ক্ষর- আত্মানে ঈশতে দেবঃ একঃ।
তস্য অভিধানাৎ যোজনাং তত্ত্বভাবাৎ
ভূয়ঃ চ অন্তেঃ বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ।। (শ্বে. উ. ১/১০)

সৃষ্টির মাঝে প্রকাশরূপ আর মহাশূন্যবৎ অনির্বচনীয় নির্বিশেষ নিরাকার নিরঞ্জন রূপ তাঁর দু'টি প্রকাশ ক্ষর আর অক্ষর। ক্ষর পুরুষই হয়েছেন সর্বভূতের সমগ্র অস্তিত্ব সমূহ আর অক্ষর এ সবের থেকে যেন স্বতন্ত্র হয়ে বিরাজমান। তিনি স্বয়ং প্রকাশ। ইনিই নিত্য দিনের দিব্য চেতন। এই অনন্ত ব্যাপ্ত ব্রহ্ম প্রকাশ জীবের জীবন মাঝে নিয়ে এসেছে তার বিকাশ বার্তা। তিনি সার্বিক সর্বভৌম হয়ে স্বয়ংই বিরাজমান। যে প্রাণ-মন-হৃদয় চায় তাঁর ঐ অনন্ত ব্যাপ্ত মৌল সত্যের অনুভব তাকেই যেতে হবে ডুবে অন্তর মাঝে অনন্ত সম্ভাবনাময় হৃদয় গুহারই অভ্যন্তরে। এই প্রাণ-মন-হৃদয় ঐ মহাপ্রাণের প্রাণপ্রদীপ থেকে শক্তি আলোক ও দীপ্তি প্রাপ্ত। প্রাণের প্রদীপ প্রসার ঘটিয়ে অন্তর মাঝে জাগিয়ে দেয় দেবশক্তির প্রবাহকে। এখন মন-প্রাণ-হৃদয় ব্রহ্মপদগামী হয়েই স্থিত।

অপরাজিত ঃ যা উগ্রা অর্কম্ অনৃচর।
অনাধৃষ্টম্ ওজসা।
মরুৎ ভিঃ অগ্ন আ গহি।। (ঋ. বে. ১/১৯/৪)

ব্রহ্ম আবাহনের মন্ত্রের হয়েছে জীবন ক্ষেত্র রচনা।
ধ্বনিত জীবনের আস্পৃহা ব্রহ্ম আবাহনে সাধন পর্বে।
শোর্যে সামর্থে হয়েছে ধ্বনিত দেব আবাহনের মন্ত্র।
অনিবার্যরূপ নিবেদনে ফুটে উঠেছে জীবনের তাৎপর্য।
যে আস্পৃহার আহ্বান হয়েছে ব্যক্ত জীবনে সেটি অপরাজিত।
সত্যের পটভূমিতেই হোক জীবনকে বরণ করবার দ্যোতনা।
অগ্নি দেবতারে করেছি বরণ মরুতের এই অবস্থানে।
জীবনের যা কিছু দেয় হয়েছে তারই ক্ষণ এখন প্রদানের।।

দিব্য চমৎকারিত্ব ঃ যে শুভ্রা ঘর বর্পসঃ।
সূক্ষ্মত্রাসৌ বিশাদসঃ।
মরুৎ ভিঃ অগ্ন আ গহিঃ।। (ঋ. বে. ১/১৯/৫)

জেনেছিতোমায় অনুভবের স্রোতপথে জীবনের এই প্রয়াসে
এসেছ হয়ে তুমি তোমারই পরম রূপের দূত এই জগতে।
করেছ আড়াল নিজের পরিচয় করেছ দূর ঐ নিত্য অবকাশ।
এখন এসেছে জীবনের জন্য নবীন দৈবী স্বাদ জীবন বরণে।

এসেছে নিবিড় আশ্রয় এই নবীন মন্ত্রের স্বতঃ জাগরণ পর্বে।
হয়েছে ব্যাপ্ত এই জীবনে সূক্ষ্মে-স্থূলে হয়েছে যদি জীবনময় ব্যাপ্ত।
অগ্নি দেবতারে করেছি বরণ জীবনের এই জাগরণ পর্বে।
এসেছে জীবন মাঝে তোমায় করে বরণ নিত্য পর্বে বরণের প্রয়াসে।

আলোর রাজ্যে হৃদয় দেবতা ঃ

যে নাকস্যাধি রোচনে
দিবি দেবাস আসতে।
মরুৎ ভিঃ অগ্ন আ গহি।। (ঋ. বে. ১/১৯/৬)

এখন হয়েছে উপলব্ধি ঐ আলোর জগতে হয়ে আলোকময়।
জগতের বুকে উঠেছে ফুটে আলোর প্রবাহের তীব্রতা।
নিত্য আবহে হয়েছে তোমারই এই প্রকাশ জীবনের আলোয়।
আলোর পথে হয়ে উঠুক আলোর প্রবাহ করতে বরণ জীবনে।
এখনই হয়েছে আহ্বানের প্রাবল্য জীবন মাঝে করতে বরণ তোমায়।
এখন আলোর রাজ্য হয়েছে পরিপূর্ণ ঐ জীবনের আলোক উন্মোচনে।
আঁধার বিনাশী আলোর বীজ এসেছে জীবনের পর্বে সব সার্বিকে।
অগ্নি দেবতার এই বরণ পর্বে হয়েছে জীবনের সদা জাগরণ।

সাধন প্রাবল্যের পর্বে ঃ

ইঙ্খায়ন্তিঃ পবর্তান্ এনম্।
তিরঃ সমুদ্রম্ অর্ণবম্।
মরুৎ ভিঃ অগ্নে আগহি।। (ঋ. বে. ১/১৯/৭)

সাধন পথের এই উপলব্ধির প্রবাহে হয়েছে এখন
প্রেরণার এই পর্বে পঙ্গু ও পারে অনায়াসে লঙ্ঘিতে সাগরে।
সমুদ্রের ব্যাপ্ত তোমার করুণায় হয়েছে সদাই বিদ্ধ।
ঐ অসীমের পটে হয়েছে যে ভাব প্রবাহ তারই উন্মোচন
যে জীবন পথ এসেছে এই অঙ্গীকারে হোক তারই জীবনব্যাপ্ত।
অফুরন্ত এই কৃপার প্রবাহ এসেছে জীবনের এগিয়ে চলায়।
সমুদ্র ব্যাপ্ত তোমারই এই করুণার ধারা জগৎ মাঝে হয়েছে মূর্ত।
অগ্নি দেবতার ঐ অনুভব পর্বে জীবন হয়েছে মুক্ত এই অনুভবে।

দেবপথে ঃ সাধন পরম্পরায় নানাভাবে ভগবানকে অনুভবের জন্য প্রয়াস হয়। জীব-জগৎ সর্বত্র বিরাজিত ভগবানের দিব্য স্পর্শ অনুভবে জানতে হয়। যে ভাবদীপ্তি অস্তিত্বের মধ্যে হয় স্বত প্রকাশিত তাকেই তার অবগুণ্ঠন থেকেই বাইরের জগতে উন্মোচন করতে চাই সত্যের নিবিড় উপলব্ধি। নিত্য প্রকাশে সত্যের এই উপলব্ধির পর্বে জীবনের সত্যকে জগতে করতে হয় ব্যাপ্ত। তিনি স্বয়ং প্রকাশ। আলাদা করে তার প্রকাশ উন্মোচন হয় না। তাঁকে একটু অন্যভাবে আবাহন করতে হয়।

এতৎ জ্ঞেয়ম নিত্যম্ এব আত্মসংস্থম্।
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ সত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মং এতৎ।। (শ্বে. উ. ১/১২)

কেউ পারে; আবার কেউ পারে না। জীবনের সব গতি ও আশ্রয়ের মূলে তিনি। স্বতঃপ্রকাশে তিনি জীবনের মাঝে হয়ে — উঠবেন ভাস্বর। একটু জানার পর্বেই বেড়ে ওঠে আবার একটু জানার জন্য অন্তরের আকূতি। যেমন খাদ্যলোভী মানুষ তার লোভের খাদ্য গ্রহণে রসনার তৃপ্তি দেখে আবার ঐ খাদ্যের বাসনায় হয়ে ওঠে তৎপর। ভগবৎ পথের পথিক অনেকটাই তেমন। ক্রম সঞ্চারে

দেব প্রকাশ যখন অনন্ত ভাববৃত্তের বাইরে এসে জীবের অন্তর মাঝে ফুটে উঠতে আকাঙ্ক্ষা। যেন আরও একটু উপলব্ধির স্রোত না হলে প্রাণ তৃপ্ত হচ্ছে না। থেকে যায় আকূতি। ভগবানকে বরণ করবার আকূতি আরও ব্যাপ্ত হয়ে নিবিড় হয়ে উঠবে তখন অন্তরে। যেন কাষ্ঠের অগ্নিপ্রকাশ। একটু একটু করে ঐ অগ্নি কাষ্ঠের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এমনই ক্ষণ আকূতির তীব্রতা বাড়তে দেখে। জীবনের পথচলায় চেতন রথ এখন ব্রহ্ম পথ আর জীবনের গতিমুখ হয়ে ওঠে ভগবত্তা।

স্বদেহম্ অরণিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্তর আরনিম্।
ধ্যান নিমর্থন অভ্যাসাৎ
দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ।। (শ্বে. উ. ১/১৪)

অন্তর্চেতন এমন ক্ষণে যেন অন্তর মাঝে নিরন্তর ভগবানের নাম গুনগান করেই চলবে। সামবেদের প্রধান ঋষি জৈমিনী প্রকাশ করলেন উদ্‌গীথ, ভগবানকে বরণ করে নিয়ে জীবনের মধ্যে আবাহনের দীপ্তিকে প্রবলতর করে তুলবেন ঐ নিরন্তর নাম-গুণগান স্পন্দনের মধ্য দিয়ে। তিনি জীবন মাঝে এখন হয়ে উঠবেন দিব্য আলোকবর্তিকা। অনন্ত অসীম তিনি এখন বিশ্ব মাঝে বিশ্বাত্মার বিকাশ তনু হয়ে ফুটে উঠবেন। জড় সংস্পর্শে অথবা জড় শক্তির প্রভাবে ব্যাপ্ত জীবন এখন তার বাহ্য পার্থিব সব সূত্রকে ছিন্ন করে দেবেন ঐ অনন্তের পথে পাড়ি দিতে। আলোর প্রবাহে সাধকের সমগ্র অস্তিত্ব হয়ে উঠছে আলোকময়। এখন ক্ষণ সাধন জীবন ভগবানকে জেনেছে তার অনুভব পেতে। অনুভবই হয়েছে অন্তরে বাইরে।

তিলেষু তৈলম্ দধিনী ইব।
সর্পিঃ আপঃ স্রোতসুঃ অরনিষু চ অগ্নিঃ।
এবম আত্মানি আত্ম গৃহ্যতে অসৌ
সত্যেন এনম্ তপসা যঃ অনুপশ্যতি।। (শ্বে. উ. ১/১৫)

সাধন প্রাণের উপলব্ধিতেই এখন জগৎ প্রতিভাত। যেমন তৈলবীজ এনে দেয় অন্তর্নিহিত বীজ হয়েই কণারূপ প্রকাশে। শস্যবীজ ধারণ করে থাকে তার অভ্যন্তরেই হয়ে যায় পূর্ণ প্রকাশ বস্তু। অভ্যন্তরে যা কিছু হয়ে রয়েছে সঞ্চিত, এখনই তার বিশেষ পরিচয়কে করতে হবে সমাদৃত। জীবন এমন জগৎ সত্যের মুখোমুখি। জগৎ সত্য তার বিশেষ উপলব্ধি এখন ব্রহ্ম সত্যের পার্থিব পরিচ্ছেদে। এখন আত্মার পরিচয় মিলবে দু'রকমভাবে। এক, তিনি স্বতঃই হলেন ভুবন মাঝে ভুবনের সব জীবন। আবারই হয়ে উঠবে এই আপাত সত্যের বন্ধ দরজার এখন হবে উদ্বোধন জগতের মাঝে।

একঃ দেবঃ সর্বভুতেষু গূঢ়ঃ। সবব্যাপী সর্বভুতঃ অন্তঃ আত্মা।
কর্মঃ অধ্যক্ষঃ সর্বভূত অধিবাসঃ। সাক্ষী চেতা কেবলঃ নির্গুণঃ চ।। (শ্বে. উ. ৬/১১)

অনুভবের এই দীপ্তি ফুটে উঠবে সৃষ্টির সর্বত্র। বিশ্বমাঝে বিশ্বদেব হবেন মূর্ত সবারই জন্য। জীবনের পার্থিব চেতন তার সব বন্ধনকে যদি পারে করতে অতিক্রম তবে তার মাঝে প্রস্ফুটিত হবে জীবনের এই ভাস্বর চেতন। সর্বভূতে তিনি বিরাজমান শুধুমাত্র নয়, তিনি সবারই অন্তরের সমগ্রতায় হয়ে উঠবেন চেতন ভাস্বর। ভগবানকে এমন অবস্থায় উপলব্ধি করবে জীব তার নিজের মত করেই। যেমন করে হয়েছে প্রাণের রচনা, যেমন করে ফুটে এক জাগতিক শক্তির বীজ তাঁকে এই অনন্য সম্ভাবনার মধ্যে বুঝে নিতে হবে। মায়ার জাল ছিন্ন হয়ে যায় ভগবানের এই অনুভবের সূচনায়, দেব স্পর্শের প্রবাহ জীবনকে করবে সুপ্ত-উত্থিত। যেন জীবন এই নবীন পটভূমির স্বাভাবিক স্পর্শের দ্যোতনায় তার অবদান হয়ে রয়েছে মূর্ত। প্রাণে এখন চলে এসেছে অনুভবের ক্ষণ। ভগবানকে জাগ্রত করেছে ঐ মহামায়ার পরশ। এখন স্পন্দন হয়েছে সৃষ্টি। এখন সময়ের বিশেষ এই প্রকাশ পর্ব এগিয়ে চলেছে আপাত বাস্তবকে ঐ সময়ের বন্ধনের থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেই হবে ব্রহ্ম মার্গে মিলন। চেতনার এই অবস্থানে সাধক অনিবার্যতায় উপলব্ধি করবেন ভগবৎ চেতন। এমন ক্ষণেই সাধন জীবনের আবশ্যক ঈশ্বর প্রাপ্তি।

প্রজ্ঞা সঞ্চালনে ঃ আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিঃ।
তিরঃ সমুদ্রম্ ওজসাঃ।
মরুৎ ভিঃ অগ্নে আ গহি।। (ঋ. বে. ১/১৯/৮)

হোক এই জীবন মাঝে সূর্যের আলোক দীপ্তি।
মহাপ্রাণের এই প্রাণ সঞ্চার পর্ব হয়েছে জীবনে নন্দিত।
যে বিপুল নিত্য প্রভা এসেছে জীবনের মাঝে সদা প্রত্যয়ে
হোক তারই বিপুল প্রভা এই জীবন সঞ্চারের ধাপে ধাপে।
তোমারই চেতনার হোক বিপুল বিস্তার জীবন মাঝে স্বতঃই।
এখনই হয়েছে এই জীবন পর্বের স্থিতি-গতি-বিস্তার জগতে।
আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির হয়েছে মিলন এখন নিত্য প্রভায়
এসেছে অনুভবের নির্যাস দেবতার কৃপা সংযোগে।।

তোমারই প্রীত্যর্থে ঃ অভি ত্বা পূর্ব পীতয়ে।
সৃজামি সোম্যম মধু।
মরুৎ ভিঃ অগ্ন আ গহি।। (ঋ. বে. ১/১৯/৯)
চলেছি এগিয়ে কর্মমার্গে তোমারই প্রীতির তরে।
আবাহনের পর্ব হয়েছে দৃঢ় এই নিত্য যজ্ঞের নিবেদনে।
করতে বরণ তোমায় এখন এসেছে বিশুদ্ধ মনের আবেদন।
যেমন করে এসেছে নিত্য দিনের এই প্রবাহ মাঝে মূর্ত সাধন।
তোমারই এই জীবন প্রদীপ হোক জাগ্রত কর্মের সাধনে।
এখন এসেছে জীবনের এই ক্ষণে দিব্য চেতন স্পন্দন নিত্যই।
প্রীতির এই পরিচিতির পর্বে হয়েছে জীবনের উত্তরণ প্রবাহ
তোমারই নবীন সৃষ্টির ক্ষেত্র হোক উন্মোচন সত্যের পথ প্রবাহে।।

বিশ্বাস-ভক্তির রথে ঃ পরমাত্মাই আত্মারূপে জীবনের মাঝে করছেন অবস্থান। তাঁর আত্মারূপে অবস্থান জীবচেতনের অন্তঃপুরে বিরাজমান সত্য। কাঠের মধ্যে আগুন যেমনে অবগুণ্ঠনে থাকে, অন্তর্নিহিত এই সত্যবস্তু প্রকাশের আলোয় আসে না। অগ্নির সুপ্ত অবস্থায় তার পূর্ণ সামর্থই থাকে অগ্নিশিখা হয়ে ফুটে ওঠায়। জীবনের এই পর্বও অত্যন্ত নিবিড় এক সত্যকে ধারণ করে থাকে। ওম্ মন্ত্রের সাধন যত তীব্র হয়ে উঠবে ততই ফুটে উঠবে মহিমায় অন্তরমাঝে। জগতের মাঝে জীবনের নিত্য প্রভার প্রদীপটি এমন করেই অদৃশ্য বাতির আলোকে হয়ে উঠবে দৃপ্ত দৃশ্যমান। জীবন প্রদীপ এমন ক্ষণের প্রতীক্ষায় যেন একটু মানবিক শক্তির প্রয়োজন হয়ে উঠবে নবীন এক অনন্য চেতন প্রভা।

সর্বব্যাপীনম আত্মানং ক্ষীরে সর্পিঃ ইব অর্পিতম।
আত্মবিদ্যা তপোমূলং তৎ ব্রহ্ম
উপনিষৎ পরম। তৎব্রহ্মী উপনিষৎ পরম ইতি।। (শ্বে. উ. ১/১৬)

অন্তরেই বিরাজমান তিনি আত্মা রূপে। অনন্ত তিনি স্বরাট তিনি। স্বমহিমায় মগ্ন হয়েই এসেছেন অন্তরের বাককণায়। এই আত্মাই ব্রহ্মবস্তু। প্রকাশের প্রদীপটি যতসময় শিখাময় না হয়েছে তার মৌল পরিচয়ের দীপ্তি যেন থাকে অবগুণ্ঠনে। সম্ভাবনার এই ক্ষেত্র জীবনের সর্বাগ্রে চেতনরাজ। অন্তরের চৈতন্য এই বিকাশ কোনভাবে একবার আলোক বিস্তারী হয়ে জগতের এই জীবনকে ব্রহ্ম পথে পরিচালন করে এগিয়ে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ চেতনের উৎসমূল এসে যায়। এই উৎস মূলেই বিশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসায় করতে হয় উন্মোচন। উন্মোচন স্বতঃই হয়ে যায় যেন এক স্বাভাবিক বিকাশ পথ। জীবনমাঝে এই বিকাশ সব অস্তিত্বকে অতিক্রম করে নিবিড় ঘন ভগবত্তার প্রতিমা হবে জগতের কাছে নবীন ভাগবতী বার্তার উৎস। এই নিবিড় ঘন ভাগবতী বার্তা হয়ে ওঠে নবীন সঞ্চালক। ভগবানকে শুধুই বরণ করে ভগবানের অনন্য ভালবাসা দৃঢ় পদক্ষেপে চলবে এগিয়ে। জগৎ পথই এখন ব্রহ্মপথ। অন্তরে ভগবানকে ধারণ করে বিশ্বাস ভক্তির রথে সাধক এখন জগতের ভাগবতী মানব চেতন।।

—ঃঃ—

জীবনে-জীবনে ফুটে উঁঠুক শিবচেতন

তুলি চ্যাটার্জী

জীবনের অভ্যন্তরে হোক শিবশক্তির উন্মেষ। শিবশক্তির হোক জগৎ বিকাশ। জীবের অভ্যন্তরে মহাশিব অপেক্ষমান হয়ে রয়েছেন সৃষ্টির আদি থেকে। সৃষ্টির বীজে তিনি রয়েছেন অন্বিত হয়ে। জীব মহাসৃষ্টির নিয়মেই মেতে রয়েছে সত্যের নানা আবরণের মধ্যে। এখন হোক প্রকাশ সেই শিব জ্ঞানের, চিনে নিতে সেই অনির্বাপিত শিব দ্যুতিকে অন্তর মাঝে। জীব এখন অবলোকন করুণ সেই শিব চেতনের স্পর্শকে জীবন মাঝে। প্রাণ, মন, হৃদয় হোক তৎপর এখন তাঁকে বরণ করে নিতে জীবন মাঝে। জীবনের চলার পর্বে পর্বে বিকশিত হোক স্বয়ং শিবজ্ঞান, জ্ঞান আলোয় স্নাত জীবন চলুক এগিয়ে সেই মহাপ্রাণের অভিমুখে, তাকে বরণ করে নিতে। নিজ জীবনে আহৃত শিবজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ুক অন্তরে অন্তরে, শিবস্পর্শ-সঞ্চারিত হোক জীবনের কোলে কোলে আবার একটি জীবনের স্পর্শে আরো অনেক অনেক জীবন হয়ে উঠুক শিবোন্মুখ। জীবনে জীবনে আসুক শিবচেতন।

মহাশিব সেই কালের আদি থেকে সৃষ্টির মাঝে, হয়ে রয়েছেন সদা বিরাজমান। অপেক্ষমান হয়ে রয়েছেন তিনি, যে তাঁরই সৃষ্ট প্রাণ আবিষ্কার করে নেবে তাঁরই অস্তিত্বকে জীবন মাঝে। সেই অস্তিত্বকে বরণ করে জীবন ভরে উঠবে শিবভাবে। অনুভব করবে ব্রহ্মানন্দ হৃদয় মাঝে। জীবন মাঝে ভগবৎ অনুভব পেতে প্রয়োজন প্রস্তুতির, জীবনকে প্রস্তুত হয়ে উঠতে হয় ভগবৎ স্পর্শকে লাভ করতে। জীবনকে যম অর্থাৎ সংযম-এর মধ্যে দিয়েই গড়ে তুলতে হয় আভ্যন্তরীণ বাতাবরণকে। জীবন তার সমগ্র শক্তির উদ্‌যাপন করে চলেছে, সদাসর্বদা নানা জৈবিক এবং জাগতিক ক্রিয়া সম্পাদনে। তখন প্রশ্ন ওঠে, ভগবৎ অনুভবের প্রয়োজন কোথায়, বেশ চলেছে জীবন, জগৎ-এর সাবলীল ছন্দে, কেনই বা ভগবানকে উপলব্ধির প্রয়োজন, উত্তর আসে সেই মহাপ্রাণের থেকেই। তিনিই বলেছেন যে তিনিই একমাত্র হয়ে বার্তা বয়ে এনেছেন যুগে যুগে, প্রতিষ্ঠা করেছেন ভগবৎ বার্তা জগৎ মাঝে। তিনিই হয়েছেন স্বয়ং তাঁরই বার্তাবহক। তিনিই নিরলস ভাবে তাঁর অনুভব প্রেরণ করে চলেছেন জীবনে জীবনে। সেই অনুভব লাভ করতে জীবনকে হতে হয় প্রস্তুত, জীবন প্রাণশক্তিকে করতে হয় সংহত। জীবনকে বিচার করতে হয়, নির্ধারণ করতে হয় যে কোনটি সত্য আর কোনটি নয়। কোনটি নিত্য আর কোনটি অনিত্য। জীবন যখন সদাসদ বিচারের নিরিখে নির্বাচন করে নেয় ভগবানকে তখনই শুরু হয় প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি পর্বে, প্রাণের শক্তি, মনের শক্তি এবং হৃদয়কে করে তুলতে হয় সংহত। প্রাণের শক্তিই জীবনের সব কর্মের মধ্যে নিহিত আছে, সব ভাবনা, চিন্তার মূলেও আছে সেই প্রাণ শক্তিই। সেই প্রাণশক্তির সংহত প্রকাশই আত্যন্তিক সত্যের প্রকাশ।

প্রাণের প্রকাশ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তাকে খুঁজে নিতে হয় অন্তরে বাইরে। বাইরের প্রকাশ বাহ্য চেতন গ্রাহ্য। অন্তরের প্রকাশ ফুটে ওঠে অন্তর জাগরণে। সে প্রাণ শক্তি বিশ্ব মাঝে হয়ে ব্যপ্ত, সারই প্রভায় এই আকাশ, বাতাস, সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি, বৃক্ষ, তরুলতা অন্তরীক্ষ, বায়ু, ব্যোম ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে সর্বত্র তারই অভ্যন্তরে প্রাণ কণা হয়ে বিরাজ করছেন ব্রহ্ম সনাতন। অণুতে পরমাণুতে, পলে অনুপলে তার এই প্রকাশ দৃষ্টি, শ্রুতি ঘ্রাণ স্পর্শ ব্যতি রেখে একান্ত অনুভবে, নিবিড় ঘন উপলব্ধির ধারায় ব্যাপৃত। অন্তরে প্রবেশ করে সাধন চেতন বুঝতে পারে ওই মহাসত্য মহা-বিশ্বব্যাপী ব্যপ্ত হয়ে রয়েছেন, প্রাণে প্রাণে হয়েছেন প্রাণের প্রাণবীজ আবার সেই তিনিই অবলম্বনহীন, রূপ বিহীন, কালাতীত, সদাবিচরণশীল অথচ পরিপূর্ণ স্থিত। দৃঢ় অচঞ্চল চেতন প্রদীপ হয়ে ভাস্বর হয়ে আছে-জগৎ-এর মাঝে। ইনিই সেই মহাপ্রাণ। এরই পরশে সবচেতন হয়ে চলেছে গতিময়। প্রাণে প্রাণে উপস্থিত এই চেতন, জীব চেতন রূপে ধরা দিয়েছে সাধকের চেতনে, ইনি জগদানন্দ, ইনিই আবার ব্রহ্মানন্দ। প্রাণের মাঝে ইনি প্রাণ প্রদীপ হয়ে যুক্ত হয়েছেন মহাপ্রাণের আত্ম শরীরে। ইনিই পরম সত্য। তাঁরই উদ্দেশ্যে আমাদের আহ্বান এই জীবন মাঝে।

—ঃঃ—

জীবন উদ্ভাসিত ভগবৎ ভাব-স্পর্শে সদাই

বুকু বসু

ভগবান লাভই হোক জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভগবানকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠুক সমস্ত জীবন বোধ, জীবনের কর্ম, জীবনের ভাবনা, জীবনের চিন্তা। প্রতি প্রাণে প্রাণে হয়ে উঠুক তিনি ভাস্বর। যে প্রাণ চেয়েছে তাঁকে একবার সত্যি করে—সেই প্রাণের প্রতি হয়েছেন তিনি করুণাময়। যে প্রাণ বুঝতে চেয়েছে তাঁকে একবার সেই প্রাণের প্রতি তিনি হয়েছেন কৃপাময়। সব প্রাণের অন্তরে

বিরাজ করেও তিনি হয়ে রয়েছেন সাক্ষী স্বরূপ। জগতের চাকচিক্যেতে যত মন থাকবে ব্যস্ত তত থাকবে তাঁকে ভুলে। সেই সব প্রাণের ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষী হয়েই থেকে যান সর্বদা। আর যখন কোন প্রাণ সৃষ্টি কর্তাকে বুঝতে চায়, সৃষ্টিতে মনকে না ভুলিয়ে রেখে তখনই তাঁর ঘটে উত্তরণ। তাঁর ভাবনার নিত্য পরশ চেতনার জাগরণ ঘটায়। চেতনা মূলাধার থেকে সহস্রার এ ধাবিত হয়। চেতনার এই ক্রমাগত জাগরণ ভগবৎ চেতন রাজ্যকে মানুষের মধ্যে মানুষের ভাবনার মধ্যে সুদৃঢ় করে দেয়। বাসনা-কামনা, সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণার-অনুভূতিতে ক্রমে সরিয়ে রেখে এক-অনাবিল আনন্দের দিকে মন-প্রাণ-হৃদয় ধাবিত হয়। এর নাম ভগবৎ আনন্দ। তিনি সদা-আনন্দ স্বরূপ তাই তাঁর ভাবনার আনন্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

"মানবিক প্রবণতা সবই আত্ম-সুখের সন্ধানে নিয়োজিত সকলেই খুঁজছে সুখী, সুন্দর, মনোরম, প্রশান্তি-ময় উন্নত জীবন। জীবনের অন্বেষার যদি সবটাই সুখের না হয়। তবে এর অধিকাংশই চলে ঐ সুখের আর তৃপ্তি সাধনের প্রয়াসে। সুখ সন্ধান করেই সুখ লাভ করবে এমন নয়। সুখ সন্ধান করেই জীবন বেশীরভাগই চলে আশায় আশায়। যতই সুখের প্রতি আকর্ষণ জেগে ওঠে, ততই আসে দুঃখের আহ্বান। সুখের প্রতি এই আকর্ষণ আর দুঃখের আবর্তে চলে জীবনের ওঠানামা। যেমন ঢেউ-এর উঁচু আর নিচু স্তরের মত। যখন ঢেউ-এর শীর্ষে থাকা হয়—তলদেশের খবর ভুলে গিয়ে আকাশের দিকে এগিয়ে চলে জীবন তরী। জীবন যেমন বহু জীবনের স্বাদ পূরণ করতে চায় তেমনি বহু জীবনের জীবন ভারকে বরণ করে সম্মুখ-পানে নিতে পারে পদক্ষেপ। এর ফলে একটি জীবন বহু জীবনের জাগরণের কারণ হয়ে ওঠে।

(বেদ বিজ্ঞানের গভীরে, ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৮০)

সাধারণ মানবিক প্রবণতা সমৃদ্ধ মন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখের অনুসন্ধান করে। সুখ অন্বেষণে দুঃখকেও সাথে সাথে নিয়ে আসে। সুখ এবং দুঃখ পরস্পর অবস্থান করে একইসাথে একটা আসলে অন্যটা আসবেই। তাই সুখ দুঃখের বিচারে না গিয়ে ধরতে হবে ভগবানকে সরাসরি। তিনিই পারেন একমাত্র এই সুখ-দুঃখ থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে আনন্দে হৃদয় রাজ্যকে ভরিয়ে রাখতে।

চেতনার উন্মোচনে চেতনা সুষুম্না পথে যাত্রা করে। বিভিন্ন চক্র অতিক্রম করে চেতনা যখন উর্দ্ধগমন করে তখন ভাবনার পরিবর্তন হয়ে মন এক অনাবিল আনন্দের অনুভবে মজে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। এই আনন্দের স্থিতিশীলতা বাড়তে থাকে মন-যখন অতি গভীরে গিয়ে তাঁর অন্তর রাজের সাথে যুক্ততা বাড়াতে থাকে। অর্ন্তমুখী মন এখন তাঁর ইষ্টকে অন্তরে অনুধাবন করে তাঁর পাদপদ্মে মনকে নিমজ্জিত করার ধ্যান করে চলেছে প্রতি নিয়ত। পর্যায়ক্রমে, এই সকল ধাপের মধ্যে দিয়ে, এক সাধারণ মন যে ভগবানের ভাবনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি সেই মন থেকে এক সত্য নির্ভর ভক্ত মন হয়ে ওঠে। ভক্ত মন ভগবানে অন্বীত মন। সে মন জানে ভগবানকেই একমাত্র জীবনে প্রয়োজন, সেই মন ভাবছে, ভগবানই একমাত্র জীবনে হয়ে উঠুক, ছড়িয়ে থাকুক ভগবান জীবনে সর্বত্র, তাঁর কথায় হোক প্রতিটি বাক্য ভরপুর, তাঁর লীলায় হোক প্রতিটি চিন্তা ভরপুর, প্রতিটি জ্ঞান বাণী হোক তাঁকে জেনে নেওয়ার এক, পথ, প্রতিটি গান হোক যেন তাঁরই ভক্তিগীত, প্রতিটি দৃষ্টি খুঁজুক তোমার রূপ বিগ্রহকে। অন্তরভূমি উৎভাসিত হোক একমাত্র তোমার ভাবনায়, তোমার বাক্য-নিনাদে। তোমার অর্চনাই যেন-জীবনে একমাত্র স্বীয় কর্ম বাকি সব কর্মই মা তোমার ভাবনাকে সংবদ্ধ করে না, তা যেন সবই পোশাকী। তাই ধরতে হবে সরাসরি ভগবানকে এক কঠোর প্রত্যয়ে।

"ভক্তি একটি সবচেয়ে দূরহ তত্ত্ব। ভক্তি ফুটে উঠতে পারে সেখানে যদি ভালোবাসা বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা বিরাজ করতে পারে। ভক্তি গড়ে উঠতে হলে চাই নিবিড় ভালোবাসা ভগবানের জন্য। ভালোবাসার চাই অবলম্বন। এজন্য ভক্তি একটি সূত্র হয়ে সাধককে ভগবানে সঙ্গে অন্বীত করে। ভালোলাগা, একান্তভাবে ভরপুর হতে চাই রূপময় প্রকাশ। ভগবান রূপময় হয়ে হন লীলাবিধূর। জগৎমাঝে তাঁর নিজ-প্রকাশকে নিজেই করে অনুধাবন।" (ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতৃশক্তি (জুন-জুলাই, ২০২৪ পৃঃ ৫০)

ভক্তিলতা ভগবান আর তাঁর ভক্তকে আবেষ্টন করে গড়ে ওঠে। তাঁর প্রতি ভালোবাসার গাঢ়ত্ব নির্ধারণ করে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার অনুভব নির্ধারণ করে দেয় গাঢ়ত্ব। তাঁর রূপ প্রকাশ জগতের সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তন হতে থাকে। তাঁর প্রতিটি রূপ-প্রকাশই ভক্ত লীলায় ভরপুর। এখন এই মুহূর্ত ভগবানের যে রূপ প্রকাশের সম্মুখীন হয়েছি তা-এক সুন্দর -মধুময় প্রকাশ তাঁর। তিনি মধুময়। তাঁর স্পর্শে সাধক জীবনের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে প্রতি-নিয়ত। এখন প্রার্থনা-ভগবানের কাছে ভগবান তোমার স্পর্শে ঘুচিয়ে দাও যত অন্ধকার আছে জীবনকে উদভাসিত করে দাও তোমার জ্ঞানের আলোর স্পর্শ আর তোমার প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়ে দাও আরও যা ছিল তা শতগুণে বৃদ্ধি করে দাও।

—ঃঃ—

পরম সত্যকে হৃদয়ে করতে হবে ধারণ

তানিয়া ঘোষাল

বিশ্বসৃষ্টির সূচনায় পরব্রহ্ম নিজেকে বহু ভাগে বিভক্ত করে এই সৃষ্টি রচনা করলেন। অর্থাৎ এই সৃষ্টির প্রাণ, অপ্রাণ সবেতেই তিনি বিরাজিত করলেন নিজেকে। তাই তো ঋষি বললেন " নাহং মন্যে সু বেদ ইতি নো ন বেদ ইতি বেদঃ চ।" অর্থাৎ এই সৃষ্টিতে এমন কেই নেই যে ব্রহ্মকে জানে না। জীব জড় অস্তিত্ব ব্যতিরেকে সবেতেই তিনি বর্তমান। সমগ্র সৃষ্টি এবং এই সৃষ্টিজাত সমস্ত সত্ত্বারই রয়েছে ভাগবতী ভাববিকাশের সম্ভাবনা। যখনই যে প্রাণ তাঁকে চাইবে তিনি ধরা দেবেন তার কাছে। যে চায়, সেইই পায়। দৈবী প্রেরণা নানা অস্তিত্ব ব্যতিরেকে সবার কাছেই প্রেরিত হয়। কিন্তু সেই দৈবী প্রেরণাকে গ্রহণ সেই করতে পারে যার তাঁকে গ্রহণ করবার অভীপ্সা রয়েছে। দেবী প্রেরণা ধারণের উপযুক্ত পাত্র হয়ে তৈরী হতে হয়। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তাঁকেই আকড়ে ধরতে হয়। যখন জীবন জগতের মাঝে বিরাজ করে তখন জাগতিক সুখ, দুঃখ, চাওয়া পাওয়া, না পাওয়া, লোভ লালসা, মোহ জীবনকে প্রভাবিত করবেই। সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সবকিছুর মধ্যেও যে ভগবানকেই ধরে থাকতে চায়, তাঁকেই ভালবাসতে চায়, যার প্রার্থনা শুধু ভাগবতী শ্রীচরণে ভক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ থাকে তাকে আর জাগতিক সুখ দুঃখ ছুঁতে পারে না। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন চারিদিকে নিজের বিপরীতে নিজের স্বজনদের দিকে চেয়ে দুঃখে—মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। যুদ্ধের পটভূমিতে তাঁরই বিপরীত তার একান্ত সব প্রিয়জন, পূজনীয়রা দাড়িয়ে ছিলেন। প্রপিতামহ ভীষ্ম, যিনি অর্জুনকে ছেলেবেলা থেকে স্নেহ মমতা দিয়ে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন, গুরুদ্রোণ যার সব চাইতে প্রিয় শিষ্য ছিলেন অর্জুন, অস্ত্রশিক্ষার সময় গুরুদ্রোণ নিজেকে উজাড় করে নিজের সারাজীবনের অর্জিত অস্ত্রশিক্ষা অর্জুনকে দিয়েছিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত প্রিয়জনেরা। এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রপ্রয়োগের কল্পনাতেই অর্জুন মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। ভয়ে তার শরীর থরথর করে কাঁপছে, গাণ্ডীব হাত থেকে খসে পড়ে গেল, তিনি রথের উপর সোজা হয়ে দাড়াতে পারছেন না, বসে পড়লেন। বসলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদতলে। তিনি গাণ্ডীব ছেড়ে দিলেও ছাড়েননি সখা শ্রীকৃষ্ণকে। জাগতিক মোহ এসে তাঁর দৃষ্টিকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার ভক্তিকে, ভালোবাসাকে বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। অর্জুন চেয়েছিলেন নিজেকে জাগতিক মোহের অন্ধকার থেকে বার করে এনে নিজেকে ভাগবতী আলোর সম্মুখে সমর্পণ করতে। তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করলেন, হৃদয় দ্বারকে উন্মুক্ত করে সেই ভাগবতী আলোকে তার অন্তরে প্রবেশ করবার আহ্বান জানালেন। ভগবান এই আহ্বানটির অপেক্ষাতেই ছিলেন।

কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম সংমূঢ় চেতাঃ।
যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ নিশ্চিতং ব্রুহিঃ মে।
শিষ্য তে অহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। (গীতা, ২/৭)

অর্জুন উপলব্ধি করলেন যে মহাভারতের যুদ্ধের পটভূমিতে দাড়িয়ে যে চারিত্রিক দুর্বলতার প্রদর্শন করছেন তা তার মত একজন বীরের পক্ষে শোভা পায় না বিশেষত সেই বীর যার হাত ধরে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। অর্জুনের মত পরিস্থিতি সাধারণ একজন ভগবত্ত অভীপ্সুর জীবনেও আতে পারে যেখানে সে এমন কিছু বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে যা তাকে শোভা পায় না। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একটাই পথ। ভগবৎ চরণে নিজেকে সমর্পিত করা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে একটি বার জানলা খুলে দিলে তা সূর্যের আলোয় ভরে ওঠে, তখন সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। যদি মন আসক্তি, ভয়, দুর্বলতার অন্ধকারে ঘিরে থাকে যদি হৃদয়ের দরজা ভগবানের কাছে উন্মুক্ত করতে পারা যায়, তখন সেই হৃদয় উজ্জ্বল ভাগবতী আলোয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন তার কোনো অন্ধকার থাকে না। অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব ছুটে গেল ঠিকই কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরে রেখেছিলেন। হৃদয় আসক্তি ভয়, দুর্বলতার অন্ধকারে ডুবে থাকলেও তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উন্মুক্ত করলেন। অর্জুন নিজেকে সমর্পণ করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে। ভগবান তখন অর্জুনকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন পরম সত্যের দিকে। ভগবান স্বয়ং নিজ হাতে প্রস্তুত করলেন অর্জুনের হৃদয়কে। তিনি অর্জুনকে ব্রহ্ম শিক্ষা দান করলেন। অর্জুনের অন্তর্দৃষ্টি, অন্তশ্রুতি, হৃদয় গুহার দ্বার উন্মোচিত হল। অর্জুন ভগবৎ কৃপায় বিশ্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করলেন। ভগবান তাঁর সর্বোচ্চ রূপে ধরা দিলেন অর্জুনের কাছে।

ভগবান সৃষ্টির কণায় কণায় নিজেকে করলেন প্রতিস্থাপিত। যিনি বিশ্বাসে, ভালবাসায়, ভক্তিতে তাঁকে চেয়েছেন তিনি তাঁর কাছেই নিজেকে উন্মোচিত করেছেন। যে হৃদয় নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছে তাঁর জন্য তিনি সেই হৃদয়ের কাছেই উপস্থিত হয়েছেন। সে হৃদয় তাঁকে কাছে পেয়েছে সর্বদা। তাই সাধক প্রাণের কর্তব্য হল হৃদয়কে সেই পরম সত্য ধারণের উপযোগী করে গড়ে তোলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাননি। কারণ তখনও অর্জুনের দৃষ্টি, শ্রুতি, হৃদয় পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়নি বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য। দৈবী প্রেরণা সদা প্রবহমান, দৈবী প্রেরণা, আহ্বান, আশীর্বাদ সৃষ্টির স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে সদাই। দৈবী প্রেরণা সমগ্র সৃষ্টির কাছে সদা সর্বদা প্রেরিত হয়ে চলেছে। দৈবী প্রেরণা আধার খোঁজে, আহ্বান খোঁজে, যে প্রাণ জাগতিক বিষয়াদিতে মগ্ন সেই প্রাণে দৈবী প্রেরণা সমাহিত হতে পারে না। ফিরে চলে যায়। কিন্তু যে প্রাণ ভগবানকেই খুঁজে ফেরে। তাঁকে বুঝতে চায়, জানতে চায়, কাছে পেতে চায়, হৃদয়ে সেই ভাগবতী স্পর্শকে উপলব্ধি করতে চায়, দৈবী প্রেরণা সেই হৃদয়ে এসে স্থিত হয়। ওঁ আপ্যায়ন্তু মম অঙ্গানি, বাক্, প্রাণঃ, চক্ষুঃ স্তোত্রম অথ বলম ইন্দ্রিয়ানি চ সর্বানি। ঋষি ভগবানকে আপ্যায়ণ জানাচ্ছেন তার অঙ্গে অঙ্গে স্থিত হওয়ার জন্য। বাক্, প্রাণ, চক্ষু আদি সব অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়তে ঋষি ভগবানকে স্থিত হতে অনুরোধ করছেন। এই মুখ যেন শুধু ভগবানের কথাই বলেন। চক্ষু যেন শুধু তাঁকেই দর্শন করতে চায় এবং দর্শন করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। কর্ণ যেন ভাগবতী কথাই শ্রবণ করতে চান। সাধক প্রাণের হৃৎকেন্দ্রে সেই দিব্য ভাগবতী আলোক যা অনাদর অবহেলায় পড়েছিল। তারই যেন পূর্ণ বিকাশ ঘটে। হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূরে গিয়ে দিব্য উজ্জ্বল, কোমল আলোর স্পর্শে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

যখন হৃদয় মাঝে দিব্যদ্যুতি উন্মোচিত হয় ভগবৎ বিশ্বাস দৃঢ় হয়, দিব্য উপলব্ধির দ্বারও উন্মোচিত হয়। ভাগবতী অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়। তাঁর সাথে কতরকম বাক্যালাপ চলে। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ঠিক ভুল চিনিয়ে দেন। হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেন সত্যের পথ দিয়ে। তখন তাঁকেই আঁকড়ে ধরতে হয়। ভাগবতী ভাবকেই এক এবং একমাত্র করে রাখতে হয় জীবনে। ঋষি বলছেন ভাগবতী ভাবের লালন বর্ধন করতে হয় তাঁর নাম, গুনগান, লীলা স্মরণ, জপ ধ্যানের মাধ্যমে তখন সাধক হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে ভাগবতী ভাবে। এই ভাবের সাগরে যখন ভক্তির ঢেউ ওঠে তখন ভগবৎ প্রাণে জাগে শিহরণ। এই ভাগবতী শিহরণ ধীরে ধীরে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিস্তার ঘটে। কোষে কোষে ভগবানের নাম গুণগান হয়। হৃদ্‌স্পন্দনে স্পন্দনে ভাগবতী নাম ধ্বনিত হয়। ভগবৎ আবেশে পূর্ণ ভাব নিমজ্জিত হয় সাধক প্রাণ। শুরু হয় তাঁকে জীবনের সাথী হিসাবে পাওয়ার মাত্রা। হে প্রভু এই প্রাণের সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্থিরতা, ভক্তি, ভালোবাসা প্রদান কর যা দিয়ে চিরকালের জন্য তোমায় লাভ করা সম্ভব। সর্বক্ষণে হৃদয়ে তোমায় উপলব্ধি করা সম্ভব, যা দিয়ে এই হৃদপদ্ম তোমায় ধারণে সক্ষম হবে। তোমার ঐ দিব্যভাবের প্রকাশ, বিকাশ, ধারণের উপযুক্ত করে গড়ে দাও এই প্রাণহৃদয়কে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—ঃঃ—

অন্তরে হয়েছে দিব্য প্রাণ প্রদীপ

সায়ক ঘোষাল

অন্তরের প্রেরণাই মানব মনকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় এবং উদ্যোগ নিতে সাহায্য করে নিজের শ্রেয় পথের দিকে। মানব মনের প্রতিটি পদক্ষেপ নির্মাণ করে তার চরিত্র এবং জীবনের কাঠামো। এই পদক্ষেপ গুলি ঠিকও হতে পারে আবার ভুল কিন্তু তার আগে প্রাথমিক ভিত্তি হল এই মানব অন্তর কোন জিনিসের ওপর সমর্পিত। সমর্পিত অর্থাৎ মানব মন কোন বস্তু বা ব্যক্তির দ্বারা প্রেরিত, মন কোন ব্যক্তিকে অনুসরণে তার জীবনের রচনা করছেন। জগতে ভালো মন্দ ভুল ঠিক বিচার করতে গেলে জীবন অতিবাহিত হয়ে যাবে কিন্তু এর বিচার করা শেষ হবে না তাই মনকে যে বস্তু বা ব্যক্তি ভগবৎ পথে বা সত্যের পথের প্রেরণা জাগায় সেই ব্যক্তির দিকে মনের সমর্পণই পূর্ণকর্ম। এই বস্তু বা ব্যক্তি নিজের মনও হতে পারে যে আগে থেকেই ব্রহ্মে স্থির। যে মনের আশ্রয় ব্রহ্মচরণে আছে সেই মন পরমব্রহ্মে অবয়ব বা গর্ভগৃহ থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন সেই মনের কখনো বেচালে পা পড়ে না। কারণ মনটির মধ্যেই ব্রহ্মে বাস হয়ে রয়েছে। যে পরম ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তাঁর অবতার রূপ অবয়ব নিয়ে হাজার কিলোমিটার দূরে থাকুক বা শত আলোকবর্ষ দূরে থাকুক সে মনের মধ্যেই বসবাস করছেন। তিনি ভালোবাসা ছাড়া ভক্তি ছাড়া আর কিছু তার লাগে না ভক্তের মনের উন্নতিই তাঁর ইচ্ছা। তাই ভগবৎভাবে সমর্পিত হওয়ায় শ্রেয়। ভগবৎ ভাবে যখন মন

ডুবে যায় তখন সেই জগতের সব অভিমানে উত্তীর্ণ হয়ে চেতনার শীর্ষে পৌঁছে যায়। ভগবানের স্পর্শে মন তখন উন্নততর হয়ে ওঠে। যখন এটি হয়ে ওঠে অভ্যাস তখন আর কিছুই আটকাতে পারে না ভগবৎ ভাবে উন্নত হতে। মন হল প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু। এই মনকে সেই সত্যের পথের সঙ্গে রাখলে মন তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে সমর্থ হয়। যখন ভক্ত মন সেই ভগবৎ ভাব আহরণের জন্য উৎসাহী হবে সমগ্র প্রকৃতি তাকে সাহায্য করবে সেই রশদ যুগিয়ে। বাতাসে বাতাসে সেই সুমধুর সুরের গুঞ্জনে ভরে উঠবে। বহু বার্তাবহন করে নিয়ে আসবে ভক্তের কাছে। ভক্ত সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করবে। ভক্ত মন পাত্র তখন ভক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবে। সে বুঝবে ভগবান সর্বদা তারই সাথে রয়েছেন তার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তার ভাবে যোগ দিতেছেন। সর্বক্ষণ সেই মধুর বার্তা হৃদয় ছুঁইয়ে যাবে মনের পরিবর্তন হবে, সাথে চরিত্র হয়ে উঠবে ভগবতী চরিত্র। এই জীবন যজ্ঞে ব্যস্ত হবে সেই দিব্য অগ্নি। সেই জীবন যজ্ঞে উত্থিত হবে দিব্য সত্যের শক্তি। সেই দিব্য সত্যের ছন্দে নিত্য নবীন এক সূচনা হবে ব্রহ্ম জানার এবং চেনার। এতদিন যে দিব্য সত্য সুপ্ত অবস্থায় সঞ্চিত ছিল মনের মধ্যে হবে তার প্রকাশ জগৎ মাঝে জীবনের মাঝে। কৃপার পরমে হবে সঞ্চার ভগবৎ প্রজ্ঞার, এই প্রজ্ঞাই অনুভবে উপলব্ধিতে হবে ক্রমশ বর্ধিত হয়ে মনকে পুষ্ট করে তুলবে ভগবৎ ভাবে। এখন ভক্তমন ভাবস্পর্শে ডুবে থাকবে কর্মের মাধ্যমে। যে কর্ম জগৎ কর্ম বলে জ্ঞাত হত, আজ তা ব্রহ্মপ্রজ্ঞার উপলব্ধির পরশ পেয়ে হয়ে যাবে দিব্যকর্ম। জগতে এখন ভক্তের কর্মী রূপের সূচনা। এতদিন যা উপলব্ধি এসেছে সেই উপলব্ধিকেই আরো উপলব্ধির মাধ্যমে কর্মের রূপে এক আকার দেওয়া এখন ভক্তরে উদ্দেশ্য। কর্ম, চিন্তা, প্রজ্ঞার সঞ্চারে ভক্তির শক্তি সংহত হয়েছে জীবন মাঝে।

—ঃঃ—

খেই ছিল হয়ত বা, হারিয়েছেও কখনও

মনোজ বাগ

সূত্র ঃ অকুল পাথার। উথাল পাতাল তরঙ্গ। এই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ পাথারেই কুটো আঁকড়ে ভেসে আছি, কীট। বাহাদুর কাঠে চলে মাছি, হাতি। আবার এই পাথারই জগৎ, এই পাথারই জীবন যাদের, তারাই সাধন করছি এ পাথারের পারে চলে যাবার। যেখানে পাখারের উথাল-পাতাল নেই, তলিয়ে যাবার অতলতা নেই। কারণ এ পাথার যে বড়ই ঝক্কির, ঝঞ্ঝার। এখানে কোন স্বাচ্ছন্দ্য নেই, স্থিরতা নেই। স্বাচ্ছন্দ্যই চাই জীবনে, ঝক্কি নয়। সদাই ঝঞ্ঝা, ঝক্কি পুইয়ে কাঁহাতক আরো বাঁচা যায়। তাই এ পাথারে আর নয়। চলে যাব তারই পারে— সেখানে, যেখানে আর কোন ঝক্কি-ঝঞ্ঝা নেই। কিন্তু কোথায় মিলবে সেই পার? এ পাথারের যে পারই নেই। এ পাথার যে অপার। এ পাথার যে বাহ্যত চির ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধই। এ পাথার যে এ রকমই। কোন পাথার-বাসীরই সাধ্যে যে নেই, এই পাথারের বাইরে কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে ঠাঁই গাড়ার। তা হলে উপায়?

জঙ্গলে বাস করতে করতেই, জঙ্গল জীবনের শ্বাপদ সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে থেকেই মানুষ একদিন ভাবনা করেছে এই আপদের থেকে মুক্তির। তখনও মানুষ বাস করে খোলা আকাশের নিচে। জীবন নির্বাহ করে বনের ফল—মূলে, শাক-পাতায়। মানুষ অন্যের মেদ-মজ্জা চিবিয়েছে এর অনেক পরে। অন্যকে মেরে তার মাংস আগুনে ঝলসেছে এরও অনেক পরে। যদিও প্রকৃতিগত ভাবে মানুষ কোন দিনও মাংসাষী ছিল না, আজও মানুষ মাংসাষী নয়। মানুষ সার্বভুক ট্যাকায় পড়ে। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ শাকাষী। মেরে, কেড়ে খাওয়া সভ্য মানুষের স্বভাবও নয়। মানুষ পশুর থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ছিল তার মেধার বিশেষত্বে। তার উদ্ভাবনার গুণে। যদিও উদ্ভাবনা প্রাণের প্রতটি স্তরেই আছে। তবুও মানুষের মধ্যে সে উদ্ভাবনা তা ছিল অভূতপূর্ব। প্রতিনিত্যের চর্চায় মানুষ সেই উদ্ভাবনাকে অনন্য স্তরে নিয়ে গেছে। মানুষের এই উদ্ভাবনার মূলে আছে তার মনের একাগ্রতা।

তার ক্ষুধা ছিল শরীরে, শিল্প ছিল মননে। ক্ষুধা তৃষ্ণা তার দেহের বৃত্তি। শিল্পের উদ্ভাবনা তার মনোজাত হলেও তার এই উদ্ভাবনার অনুপ্রেরণা প্রকৃতিই। প্রকৃতি স্বয়ং শিল্পী। প্রকৃতিজাত প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই জননীর এই মহাভাবটি আছে। পশু পাখিতেও আছে। কীট পতঙ্গেও আছে। উদ্ভিদেও আছে। মানুষ এই প্রকৃতিরই নিত্য সংশোধিত, নিত্য পরীক্ষিত, পরিশীলিত একটি প্রাণবন্ত শিল্পকর্ম। অভিব্যক্তি, অভিযোজনের বিজ্ঞানও এই সত্যে সায় দেবে। তবে মানুষের বাড়বাড়ন্ত শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও। তার আত্মবোধ, আত্মোপলব্ধি ভিতরে যতটা, আত্মপ্রকাষ আত্মবিকাশ ততটা বাইরেও। এই ভিতরে-বাইরে সমান সঙ্গতে বাড়া, পৃথিবীতে জীব জগতের আর কোন প্রাণীতেই সম্ভবত নেই। থাকলেও সেই প্রাণীদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। এই

ভিতর ও বাহিরের সমান মাত্রার বিকাশ আমদের জানা জগতে আর কোথাও দেখাও যায় না। মানুষে জীবে অন্তর্বিকাশের পরম্পরা ধরা আছে তার ভিতরের ঋষিত্বের ক্রম বিকাশে। মানুষে জীবত্বের বাহ্য বিকাশের ক্রম প্রণতির প্রমাণ আছে তার ক্রম বিকাশমান সভ্যতার প্রতিটি পরতে পরত। যা জগতের অপর জীব কূলের কাছে আশ্চর্যেরই, অসম্ভবেরই। কিন্তু মানুষ এর সবটা পেরেছে তার মেধার চমৎকারিত্বে ও মহাজগতের সঙ্গে তার পরম একাত্মার বোধে। জগতে কত প্রাণীই তো আছে। আবার এটাও সত্য কত মানুষও জগতে আছে। সিংহভাগ মানুষই তো পশু পাখি কীটপতঙ্গের মতো রোজ কী খাই, কী করি নিয়েই বেঁচে আছে। মহাজগতের সঙ্গে একাত্ম থাকছে ক'জনই বা। যদিও মানুষের সভ্যতায় একের উদ্ভাবনার ফল অনেকের জীবনকে ঋদ্ধ করে মত বিনিময়ের প্রবলতা ও যে কোন কিছু অনুকরণের সহজাত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সারাৎসার স্মৃতিতে ধারণ করে রাখার অনন্য গুণের কারণে। এই বৃত্তি মানুষের জীবনকে অনন্ত ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধে মানুষের জীবনকে আরো আরো বিকশিত হবার ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

শুনেছি বিজ্ঞানের বিগ ব্যাঙ্ থিয়োরী বলে ঃ আনুমানিক প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে সৌরজগতের একগুচ্ছ মহাবিস্ফোরণের ফলস্বরূপ পৃথিবী নামক গ্রহ বা আমাদের এই ধরিত্রীর সৃষ্টি। আধুনিক বিজ্ঞান অনুমান করছে, আজ থেকে প্রায় ৩৮০ কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতেই জীবনের উদ্ভব। আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ হোমিনিডদের আবির্ভাব প্রায় ৭০ লক্ষ বছরেরও আগে। স্তন্যপায়ী প্রাণী প্রাইমেটদেরই ধারা বিবর্তনে বানর প্রজাতির হোমিনিড উপশাখার ক্রমবিবর্তন থেকেই হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স অর্থাৎ আজকের মানব জাতির উদ্ভব। যা প্রকৃতগতভাবে হোমো প্রজাতির প্রাণী, সেপিয়েন্স অর্থাৎ জ্ঞান যুক্ত। মানতে কষ্ট হলেও সত্য—আমরা মানুষরা প্রাণী জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করা এক শ্রেণীর Apes বা বানর প্রজাতির প্রাণী। নিয়মিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাই হোমিনিডদেরই আজকের হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রাণের প্রতিটি স্তরেই কম বেশি আছে। এর ইতিহাসও দীর্ঘ সময়ের। এই দীর্ঘ সময়ের জীবন যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, তার চর্যার সারসত্য পর্যায়ক্রমে আজ পর্যন্ত পরবর্তী প্রতিটি পর্যায়কেই প্রভাবিত ও পুষ্ট করে চলেছে। নদীকে যেমন উৎস থেকে নির্গত হয়ে একটি একটি ঘাট অতিক্রম করে তবে সামনে এগিয়ে যেতে হয় এবং প্রতিটি ঘাটের সত্য ঘাটের সত্য অন্তরে ধারণ করেই, বহন করেই তাকে চলতে হয়, তেমনি জীবনকেও ধারণ ও বহন করতে হয় তার পূর্ব পূর্ব অবস্থানের সত্য। তাই হোমো সেপিয়েন্সের আলোচনায় পৃথিবীর ৩৮০ কোটি বছরের জীবনের ইতিহাসের আলোচনাটিও অনিবার্যই।

কিছু আদি কথা ঃ একটি অখণ্ড অবস্থা এই মহাবিশ্ব। একটি অখণ্ড সত্য এই মহাবিশ্ব। যা সদাসর্বদা অবস্থানওকরেন তাঁর স্ব-অবস্থায়। অখণ্ডতায়। এটিই পরম অবস্থা। এই পরম অবস্থারই অন্তর্গত এই মহাবিশ্বের আর সব অবস্থা। যেমন কোন মহাজাগতিক কারণে মহাশূন্যের একটি বিরাট জ্যোতিষ্কের স্বপরিবারে বিপুল ভরের কোন ব্ল্যাকহোলে পরিণত হওয়া এবং আমাদেরই বাড়ির উঠোনের কোন এক কোণায় বেড়ে ওঠা কোন আগাছার ক্ষীণ একটি শাখায় ফুটে ওঠা একটি ফুলের আত্মপ্রকাশ, একই ঘটনাক্রমে বাঁধা। এই দুটি টনাই একটি ঘটনারই দুটি ভিন্ন স্থানের, ভিন্ন পরিস্থিতির দুটি ভিন্ন প্রকাশ। কোন ঘটনাটি কয়েক লহমার অতি ক্ষুদ্র একটি স্থানের ক্ষুদ্র পরিসরের ঘটনা, কোনটি বিরাট কোন ক্ষেত্র জুড়ে বহু আলোকবর্ষ ধরে ঘটে চলা টনা। স্থান বিশেষের ঘটনাগুলি আপাত অবস্থার প্রকাশ। পরম অবস্থা বিরাজ করে সবটুকু জুড়ে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। এই অবস্থাটির কোন ছেদ হয় না।

এই পরম অবস্থাই ব্রহ্মাবস্থা। স্থূলদৃষ্টি বাহ্যত জগতের যত দূর যায়, সূক্ষ্মদৃষ্টি বস্তুর যত গভীরে পৌঁছোয় এ সবের সীমা ছাড়িয়ে আরো আরো দূর, যা আমাদের ইন্দ্রিয়েরও অগোচর, সেই সবটা নিয়েই অবস্থান করছেন পরম স্বয়ং। তিনি নিজেতে নিজেই অবস্থান করছেন। তাঁতে অবস্থান করছে তাঁর সমস্ত কিছু। বাস্তবটা যেন একটা সত্তা অবস্থান করছেন তাঁর শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে তাঁর নিজেরই শরীরে, নিজেরই সত্তায়। এই সত্তাটিই পরম ব্রহ্ম। এই শরীরটিই পরম জগৎ। এই শরীর জুড়ে ঘটে চলা সব ক্রিয়াই পরম জগৎ-ক্রিয়া। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ঋষি বলছেন—

"যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি; যৎ প্রয়োন্তিঃ অভিসংবিশন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম ইতি।" জগতের সমস্ত কিছু যা থেকে অদ্ভুত হচ্ছে, যাতে অবস্থান করছে ও তিরোহিত হচ্ছে সেটিই ব্রহ্ম।

ভাগবত গীতায় যে ব্রাহ্মীস্থিতির উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মীস্থিতি এই পরম ব্রহ্মাবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির অন্তরের ওতোপ্রোত অবস্থা। যে অবস্থায় ব্যক্তির ব্যক্তি অভিমান শূন্য হয়ে আছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথানুসরণ করে বললে, সমুদ্রের জলে যেন গুলে আছে সমুদ্রে ভেসে থাকা নুনের পুতুল বা অন্য ভাবে বললে, মানুষটি যেন জ্যান্ত মৃত। যেন জলে গুলে আছে জলেরই বরফ। যেন বাহ্য দৃষ্টি দেখছে সমুদ্রের ভাসছে নুনের পুতুল, কিন্তু আসলে নুনের পুতুল জলে গুলে আছে; বাহ্য দৃষ্টি দেখছে বরফ জলে ভেসে আছে,

কিন্তু বাস্তবে বরফ জলে গুলে আছে। পরম অবস্থা এই গুলে থাকা অবস্থা। যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব যেন নেই। যা আপাত অবস্থার আপাত ভাবে থেকেও পরমে মিশে থাকা একটা অবস্থা।

বাহ্যত এ জগতে যা কিছু আছে সবই আছে ব্রহ্মে। জগতে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। সমস্ত কিছুই ব্রহ্মের। সমগ্র মহাবিশ্বটাই ব্রহ্মের, পরমের। ফলত মহাবিশ্ব জুড়ে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে সবই ব্রহ্মের। নীহারিকারা ব্রহ্মের। নক্ষত্র, নীহারিকাদের মধ্যবর্তী শূন্যতাও ব্রহ্মের। ঋষি বললেন, ব্রহ্ম আছন ব্রহ্ম জুড়ে। তিনি আছেন নিজেতে নিজেই। তিনি একমেবোদ্বিতীয়ম।

সময় যেন তাঁর স্পন্দন। যে স্পন্দন ওতোপ্রোত হয়ে আছে তাঁর সবটুকুতেই। যেমন বাক ও ব্রহ্ম এক যোগ হয়ে আছেন। তেমনই ব্রহ্ম ও সময় যা মহাকাল, আছে একে অন্যতে ওতোপ্রোত হয়ে। এমন কোন স্থন নেই যেখান এই স্পন্দন নেই। তবে এর গতির তরতম স্থান বিশেষে আছে। এই স্পন্দনই তাঁর সকল সৃষ্টির মূল। এই স্পন্দনের নির্দিষ্ট ছন্দও আছে স্থান বিশেষে। এই ছন্দের নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। সূর্য নিজে নিজেই যে ঘুরছে—এই ঘোরার একটা গতি আছে। পৃথিবী যে নিজে নিজে ঘুরছে, তারও নির্দিষ্ট গতি আছে। পৃথিবী যে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, তারও একটা গতি আছে. এই গতির সঙ্গেই তালে তাল, সুরে সুর, ছন্দে ছন্দ মিলিয়েই পৃথিবী জুড়ে থাকা সমস্ত কিছুর উদ্ভব ও তিরোভাব হচ্ছে। এই গতিরই সামান্য হেরফেরে সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য আসে। এর গতিরই বিরাট পরিবর্তনে জগতে মহাপ্রলয় ঘটে। যেখানে যত ধীর এই গতি, সেখানে তত ধীর সৃষ্টিশীলতা ও তার প্রকাশ ও বিকাশ। শূন্য সময় বলে জগতে কিছু নেই, হয়ও না। তবে যেখানে এই স্পন্দন স্থিতধীর, সেখানে বাহ্য ক্রিয়াসীলতাও স্থির হয়ে আছে। যে অবস্থাটিকেই ব্যক্তিতে আমরা জীবের সমাধিস্থ অবস্থা রূপে জানি। সমাধিস্থ অবস্থাতেও যেমন জীবের প্রাণস্পন্দনটি বর্তমান থাকে। তেমনি যেখানে সময়ের স্পন্দনটি স্থির হয়ে আছে, সেখানেও স্বমহিমাতেই বিরাজ করেন ঈশ্বর তাঁর পরম অস্তিত্বে।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আপাত যে জগৎ এরই বিরাট রূপটি মহাজগত, যা পরম স্বয়ং। এ মহাজগতের উপাদানও ঐ পরমই। ব্রহ্ম করে বললে, এ জগৎ ব্রহ্ম স্বয়ং, এ জগতের উপাদানও ব্রহ্ম স্বয়ং। এ মহাজগৎ এই অর্থে, শুধুই ব্রহ্ম-বস্তু। আমার কাল যা কিছু শুনছে, সেটিও ব্রহ্ম-বস্তুর থেকে জাত ধ্বনি। আমার মন-প্রাণ যা কিছু উপলব্ধি করছে, সেই সমস্ত কিছুই ব্রহ্মেরই অবস্থা। আমিও এই ব্রহ্মেরই অন্তর্গত কোন প্রাণবন্ত বস্তু। যাতে চৈতন্য স্বপ্রকাশ হয়ে আছে।

মহাবিশ্ব সেই অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুই, যাতে ওতোপ্রোত হয়ে আছে জড়, যা বাহ্যত অচেতন–প্রাণ, যাতে প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট। জড়ের মধ্যে আছে কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, আবার দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, শ্রুতিগ্রাহ্য নয়, সাধারণ অুভবে বোঝা যায় না এমন বস্তুও। যা আছে প্লাজমা বা আরো কোন সূক্ষ্ম অবস্থায়। মহাজগতের যেখানে যেখানে গতি আছে, এই জড় ও প্রাণের বিবর্তনে সেখানে সেখানে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এই বিবর্তন গতিরই পরিণাম। তাই যেখানে গতি আছে সেখানে বিবর্তনই বাস্তবতা। এই বিবর্তন গতিরই সূচক। যেখানে গতি নেই, সেখানে বিবর্তনও নিষ্কর্মা—যেন থেমে আছে। যেখানে সময়ও হয়ে আছে স্থির। যেন তার কোন নড়াচড়ারও শক্তি নেই। যেন তা শূন্যাবস্থা।

গতিতে জড় ও প্রাণের এ অন্তর্বস্তুরই সঞ্চালন হয় শক্তির স্বতোৎসারণে। প্রাণে এই শক্তি প্রবাহিত হয় প্রাণ থেকে প্রাণে, প্রাণের উজ্জীবনে।

প্রাণও ব্রহ্ম-বস্তু। অগ্নি এই ব্রহ্মবস্তুরই একটি রূপ। পৃথিবীতে অগ্নিই আদি। সৃষ্টির কালে পৃথিবী অগ্নিরূপই ছিল। কালে কালে এই অগ্নিই হয়েছেন তরল, কঠিন। হয়েছেন শক্ত মাটি-পাথর, হয়েছেন জল, বায়ু। হয়েছেন জীবন। ঋকবেদে ঋষি মদুছন্দার অগ্নি বন্দনায় আছে। 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবং ঋত্বিজং। হোতারং রত্নহধাতমং।'

এই আমি ব্রহ্মেরই এক অবস্থা। এই অগ্নি থেকেই উদ্ভূত আমাদের বিশ্ব-বসুন্ধরা রও তাঁর আর সব কিছু। পৃথিবীতে অগ্নিই যে কোন সত্যের আদি অবস্থা।

যে অগ্নি একটি সত্তা, আদি বীজ। যে বীজ থেকে জাত বৃক্ষটিই আমাদের জগৎ। জগৎ জোড়া যে সৃষ্টি—সবই এই অগ্নিরই বিভিন্ন প্রকাশ। জীবনে, জীবনের যা কিছু প্রকাশ, সবই এই অগ্নিরই আত্মপ্রকাশ। জড়জগতেরও যা কিছু প্রকাশ, এই অগ্নিরই আত্মপ্রকাশ। নিরুতপ্ত বস্তুতে এই অগ্নিই শক্তিরূপে সংহত থাকেন। গতিতে এই শক্তিরই হয় রূপান্তর। জীবন ধারায় এই অগ্নিই চৈতন্য। জীবন ধারায় এই অগ্নিই চৈতন্য। যেখানে সময় স্থির হয়ে আছে, এই অগ্নি আছেন গভীর সমাধিতে সমাহিত।

এই সব অবস্থান্তরেরই কারণ পরিস্থিতি। পরিস্থিতির মূল ঘটনাক্রম। ঘটনার মূলে আছে কিছু একটা হয়ে ওঠার প্রবণতা। ঋষি বলছেন, এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলেও আছে ব্রহ্মের ইচ্ছা। বলছেন, তিনি ইচ্ছা করলেন অনেক হওয়ার এবং হলেন। এই নিজেতে নিজের ইচ্ছাটি জগতের সর্বত্রই আছে। প্রতিটি জীবেরও আছে এই ইচ্ছা। তবে ব্রহ্মজাত জীবের ইচ্ছাটি যেন ঘরের মধ্যে ঘর। জীবের

আধ্যাত্মিকতা ঘরের ভিতরের এই ঘরটিকে মুছে দেওয়ারই নিরন্তর চেষ্টা। কারণ ঘরের মধ্যে ঘর হলে আসল ঘরটি সবসময় আড়ালেই থেকে যায়, আসল ঘর থেকে নজর সরে যায়। তাই পরমটিকে বুঝে নিতে হলে আপাতটিকে সরিয়ে রাখাই নিয়ম। আমি যে কেউ হই না কেন, আমি আপাত একটি সত্তা, সমুদ্রের এক টুকরো ঢেউ, গোটা সমুদ্রটা নই।

এরপরও ঘুরে ফিরে আসে ব্যক্তি ইচ্ছা। আমার ইচ্ছা। আমি কী কিচ্ছুই নই— এই ভাবনা? ধুল্ময়লাদের তবু নিস্তার আছে এই আমিত্বের টানাপোড়েন থেকে বাঁচার, বিরাট কিছুদের এক্ষেত্রে ফাঁপড়ের অন্ত নেই। ব্যক্তি ইচ্ছাই নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যক্তিকে। আমি যা মনে প্রাণে চাইছি, আমার জীবন, আমার সেই লক্ষ্যের দিকেই ধেয়ে যাচ্ছে। তবুও আমি ধুলো-মাটি হই বা সোনাদানা, এক খণ্ড ঢিল হই বা বিরাট কোন পর্বতমালা, আমি পূর্ণ নই, আমি অংশ। আমি একটি ছোট্ট আধার মাত্র। আমাতে যা ধরে তা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় খুবই সামান্যই। ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান এই ব্যক্তিত্বেরই প্রাবল্যটিকে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেওয়ার সাধনা। এটি প্রতিটি মুহূর্তের সাধনা। ব্রহ্ম ভাবনায়, ব্রহ্মের স্মরণ মননে সদা লীন থাকাই ব্রাহ্মীস্থিতি। সমাধি। এক মুহূর্তেরও ছুট্টি এই সাধনায় নেই। যেমন জীবনে প্রাণের সাধনা ঠিক তেমনি এই সমাধিস্থতার সাধনা। এই ব্রহ্মকেই ঈশ্বর করে ভাবলে, ঈশ্বরই সব। আমার দৃষ্টি যা কিছু অবলোকন করছে সবই ঈশ্বর। তবু আমার দৃষ্টি যতক্ষণ ঈশ্বর জ্ঞানে দেখা দৃশ্যাবলী দেখছে, ততক্ষণই আমার জ্ঞানে তা ধরা থাকছে ঈশ্বরেরই অংশ হয়ে। ঈশ্বরকে ভুলে থেকে এই আমিই যখন দেখছি, এই একই দৃশ্যাবলী হয়ে থাকছে নিছকই জগতের।

বিশ্ব পরিস্থিতি ঃ

ঐ বিগ ব্যাঙ্ খিয়োরী অনুসারে, আগুনের গোলা ঠাণ্ডা হতে হতে ক্রমশ কঠিন হতে লাগে কোটি কোটি বর্ষ। অনুমান সৌরজগৎ সৃষ্টির ১০০ মিলিয়ন বছর পর পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। প্রায় ৪.৫৮ বিলিয়ন বছর পর পৃথিবী গ্রহটি মোটামুটি একটা আকৃতি পায়। পায় লোহার একটি কেন্দ্র ও একটি বায়ুমণ্ডল। এখানেই ঘটনা থেমে থাকে নি। আবারও ঘটেছে সংঘর্ষ। অনুমান, খিয়া নামের আজকের মঙ্গল গ্রহের সমান একটি গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘর্ষে পৃথিবী আবারও উত্তপ্ত হয়। হয়ে ওঠে গলিত লাভার গোলা। আজকের শুক্র গ্রহের মতো তখন অবস্থা পৃথিবীর। আবারও ঠাণ্ডা হয় পৃথিবী। লাভা জমাট বেঁধে তৈরি হয় শক্ত পাথর। এর অনেক পরে সৃষ্টি হয় জলের। ঘটনা চক্রে পৃথিবীর অবস্থানও তার এই শীতল হয়ে ওঠার জন্য সহায়। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাও তার অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। পৃথিবীর অবস্থান সূর্যের সঙ্গে যে দূরত্ব বজায় রেখে আছে, সেই দূরত্বের হেরফের হলও আগামীতে পৃথিবীর অন্তর্গত সমস্ত অবস্থারই পরিবর্তন হতে বাধ্য। এমনটা জগৎ।

জগতে প্রাণের উদ্ভব, অবস্থান, তিরোভাবের যে চক্র, সেটিও ঘটনা পরম্পরা বা ঘটনাচক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রাণের উদ্ভব এই ঘটনাচক্র থেকেই, প্রাণের যে প্রধান বৃত্তি অনুধাবন—তা ক্রিয়া করে এই ঘটনা পরম্পরাকেই জানতে। শিশু, এককোষী অ্যামিবার হোক বা মানব, জীবনের শুরু থেকেই জানতে থাকে এই ঘটনাচক্র বা ঘটনা পরম্পরাকেই। বেদ এই পরম সত্যেরই অনুধাবন, উপলব্ধি। উপলব্ধ ভাব নিজের মধ্যে ধারণ করে স্মৃতি, এই স্মৃতির চর্চা বা মনন করে মন। এরপর এই উপলব্ধিরও যখন পরম্পরা এলো তখন আসে শ্রুতির প্রসঙ্গ। এর পর আসে লিপি, গ্রন্থ। বেদ এই পরম সত্যেরই উপলব্ধি, পরমের জ্ঞান। পরম জ্ঞানেরই বিপরীতে আছে পরম অজ্ঞান। অজ্ঞান, আড়াল। যথাসত্যের ধারণাটি যেখানে অধরা।

প্রতিটি জীবের কাছেই ব্রহ্মের স্পর্শ রয়েছে ধরা, কারণ চৈতন্যময় জীব ব্রহ্মেই আছে— ব্রহ্ম থেকেই সে জাত আছে। আবার তাঁর সবটাই তখনই অধরা— যখন জীব ব্রহ্ম সত্যটি ভুলে আছে। যেন ছোট্ট একটি শিশু মা-র কোলটিতে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে মনের আনন্দে খেলছে। শিশু জানে মা তাঁর ধরা-ই। মা তো তার কাছেই আছে। আবার এই শিশুই এক সময় জানে মা তাঁর কতটা অধরা। এই অধরা মা-র জন্যই শিশু তখন কাঁদে, কেঁদে-কেটে একসা হয়। আবার সেই সময়ও আসে যখন শিশু আর কাঁদ না। ভাব মা-র তা অনেক কাজ। আছে কোথাও তাঁর কাজেই। একদিন এই শিশুই যখন মাতৃময় হয়, তখন আর মা-র জন্য উতলা হয় না। মাকে নিয়ে আঁকড়াকাঁকড়িও করে না। মা সদা সর্বদাই আমার আনন্দেরই খোরাক জোগাবেন, এমন আবদারও তখন শিশু আর করে না।

জীবনে সব অন্তরায়ের বীজগুলিকে জীব নিজের অন্তরেই লালন করে তার ব্যক্তিত্বের অভিমানে। তাই বলা হল, আগে এই অভিমানটির নিধন করো। "আমি ম'লেই ঘোচে জঞ্জাল"। যদিও অনেক যত্ন করে এই আমিত্বের জঞ্জালকেই ব্যক্তি লালন-পালন করে পরম আত্মমোহে। যেখানে এই আত্মাভিমান যত প্রবল সেখানে ঈশ্বর বোধও ততক্ষীণ। আত্মাভিমান, আত্ম-আসক্তি। আত্মাসক্তি তামসিক, রাজসিক, এমনকি সাত্বিকও হয়। জীবনে সবচেয়ে কঠিন, সব চেয়ে ঘন সাত্বিক আসক্তি, সাত্বিক অভিমান।

ঈশ্বরোপলব্ধিই জীবনের একমাত্র দিব্য ক্রিয়া যা তার প্রাণের প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে ওতোপ্রোত। এই ক্রিয়াটি অখণ্ড, অটুট থাকে ব্রাহ্মীস্থিতিতে, মহর্ষি পতঞ্জলির যোগ শাস্ত্র মতে, নির্বীজ সমাধিতে। এই নির্বীজ সমাধি সেই সমাধি যখন মনে জাগতিক কোন আসক্তিই নেই। এই নির্বীজই স্ববীজ হয় জগৎ বোধে। বেঁচে থাকতে কত কত দায়দায়িত্ব পালন করতে হয় জীবকে। তখন বিশেষে ধ্যান দিতে গিয়ে জীব নির্বিশেষের ধ্যান থেকে সরে যায়। তখন বিশেষে ধ্যান দিতে গিয়ে জীব নির্বিশেষের ধ্যান থেকে সরে যায়।

আধ্যাত্মিকতার সাধনা প্রাণের স,ঙ্গে মনের সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিকভাবে এই আপাত জীবনেই পরম সত্য উপলব্ধিরই একটি উপায় করে দেয়। তবে প্রাণ ও মনের সমন্বয়টি অধরা থাকলে আধ্যাত্মিকতা কোন ব্যক্তিকেই ব্রহ্মের বা পরম সত্যের পূর্ণ ধারণা দিতে পারে না। আন্দাজ দিতে পারে মাত্র।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগ শাস্ত্রে এই সাধন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। যোগশাস্ত্রের শুরুতেই পতঞ্জলি মহারাজ বলছেন যোগ-সত্যের সার কথাটি—

"যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" — (সমাধিপাদ/যোগশাস্ত্র)। ঈশ্বর যোগ বা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা, চিত্ত চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ নিরসন হলেই সম্ভব। চিত্তে অস্থিরতা থাকলে এই একাত্মতা সম্ভব নয়।

যে অবস্থা সম্পর্কে শাস্ত্রে বহু উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে। কেউ বলছেন, "নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা"-র কথা। যেন মন হয়ে আছে, বায়ুশূন্য স্থানে জ্বলে থাকা স্থির দীপশিখাটি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারণ করেছেন, "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল" মহাবাক্যটি। অর্থাৎ আমিত্বের অভিমান সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হওয়ার অবস্থা। যে আমিটা নিজের ঐশ্বর্যে, নিজের গুণাগুণেই মগ্ন; আত্মবোধে আচ্ছন্ন, সেই আমিটার অস্তিত্ব জো সো করে নিজেই নিজের সত্তা থেকে মুছে নেওয়া— এটাই অধ্যাত্ম সাধনা।

এটি সারা জীবনের সাধনা। সারা জীবনটাই এই সাধনার। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগ-বিজ্ঞানে দুটি সমাধির প্রসঙ্গ এনেছেন। সবীজ ও নির্বীজ। নির্বীজ সমাধিই জীবনের পরম অবস্থা। নির্বীজ সমাধিতেই চিত্ত সম্পূর্ণ পরম ঈশ্বরময় থাকে। অন্য অবস্থায় চিত্ত নানান জাগতিক বিষয়ে বৃত থাকে। পতঞ্জলি বলছেন,

"সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চ অলিঙ্গপর্যবসানম্।।৪৫।।
"তা এব সবীজঃ সমাধি"।।৪৬।। (সমাধিপাদ/যোগদর্শন)।

সূক্ষ্ম বিষয় প্রকৃতি। পৃথিবীর সূক্ষ্ম বিষয়, পৃথিবীর যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ, বায়ু-আকাশ-অগ্নি। মন জগৎ জুড়ে থাকে অহংকার। অহংকার আসে জগতের প্রতি মোহ থেকে। এই সমস্তই পরম অবস্থার স্থিত হবার পূর্বের আড়াল। এ আড়ালগুলিই বীজ। পতঞ্জলি বলছেন, "নির্বিচারবৈশারদ্যে অধ্যাত্মপ্রসাদঃ"।।৪৭।। (সমাধিপাদ/যোগদর্শন)। নির্বিচার সমাধি অত্যন্ত নির্মল হলে অধ্যাত্ম প্রসাদ লাভ হয়। "ঋতাম্বরা তত্র প্রজ্ঞা"— সেই সময় বুদ্ধি ঋতম্বরা হয়। এই অবস্থায় সাধকের বুদ্ধি নিঃশংশয় ভাবে বস্তুর ঋত বা প্রকৃত স্বরূপের সাধন করে।

সবীজ সমাধির চূড়ান্ত স্থিতি ঋতাম্বরা প্রজ্ঞায়। এই অবস্থায় সাধক যে ইষ্ট বা সাধন সত্যে নিজেকে উৎসর্গীকৃত রাখেন, সাধকের সর্বান্তকরণ সেই সত্যেরই প্রকৃত স্বরূপটিকেই গ্রহণ করে। তবে ঋতাম্বরা প্রজ্ঞাতেই ভক্ত মনের অভিমান সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না। কারণ, বেদ, শাস্ত্র, আপ্ত পুরুষের প্রবচনের মাধ্যমে যে শ্রুতবুদ্ধি; অনুমান বা যুক্তি-বিচার দিয়ে যে ধ্যান-ধারণা বা অনুমানবুদ্ধি তাতে জগতের সামান্য জ্ঞানই হয়। যদিও তা থকে জাত সংস্কারে সাধক বাহ্যত, আত্যন্তিক ভাবেও অনেকটাই স্থির হয়। মনে বৈরাগ্য আসে। মন পরম সত্যের অনুগ হয়। পতঞ্জলি বলছেন, "তজ্জঃ সংস্কারঃ অন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী"।।৫০।। (সমাধিপাদ/যোগদর্শন)।

এর পরের অবস্থা নির্বীজ সমাধি। পতঞ্জলি বলছেন, "তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ"।।৫১।। (ঐ)।

হনুমানজী একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি শ্রীরামচন্দ্রময়। কথামৃতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হনুমানজী সম্পর্কে বলেছেন, হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের এত বড় ভক্ত, তিনি স্বর্গে গেলে, নারায়নকেও রাম সেজে হনুমানের সামনে আসতে হয়। নির্বীজ সমাধি মনের সম্পূর্ণ অভমান শূন্য অবস্থা। এখানে আমাদের বলার কথাটি হল, এই নির্বীজ অবস্থাটিই মনের প্রাথমিক অবস্থা — আদি অবস্থা। সবীজ অবস্থাটি পরের অবস্থা। জীবন যত বড়তে থাকে, বীজগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি করে তাঁর মনজমিতে প্রোথিত হতে থাকে। বীজগুলি অঙ্করিত হয়। বাড়ে। ফুলবতী-ফলবতী হয়। একটি জমিতেই যেমন তৃণের, গল্মর, বৃক্ষের হাজারো বীজ থাকে, জীবনেও থাকে। যদিও সব বীজগুলিই বৃক্ষ হয় না।

হারিয়ে যাওয়া আমিটিই আবার ফিরে এসে, "তুমিই আমি" বা "যে তুমি, সে-ই আমি" বা "তুমিই আমি, আমিই তুমি"— যখন এমনটা দাবি যদি করে, তাতে দ্বৈত-অদ্বৈত মিলেমিশে দ্বৈতাদ্বৈত হয়। তত্ত ভুরি ভুরি আছে, আমাদের অত তত্ত্ব নিয়ে কাজ নেই।

অদ্বৈত ভাবে মন স্থিত হলে তখন আসে একাকার অবস্থা। এই একাকার অবস্থাই পরম সত্যে স্থিত অবস্থা। এটি পরম সমাধির অবস্থা। যা চির স্বাধীন, সচল।

মন অস্থির, উৎক্ষিপ্ত হয় এই সমাধির স্থিতিটি নষ্ট হলে।

—ঃঃ—

শ্রীঅনির্বাণ—যেমনটি পেয়েছি।

আশুরঞ্জন দেবনাথ

চাকরী সূত্রে ট্রেনিং-এ গিয়েছিলাম উদয়পুর, রাজস্থানে। ছিলাম দু'মাস—১৫ই আগষ্ট থেকে ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭১ পর্যন্ত। রাণাপ্রতাপ স্মৃতি বিজারিত উদয়পুর সুন্দর। শহর—City of Lakes and Palaces. কাছেই মীরাবাই স্মৃতি ধন্য নাথদ্বার—শ্রীনাথজীর মন্দির। পথে মাটে অজস্র ময়ূর-ময়ূরী ঘুড়ে বেড়ায় রঙ্গানে পাখা মেলে।

থাকি ট্রেনিং-স্কুল হোষ্টেলে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর শান্ত পরিবেশ। লেখা-পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ। ছকে বাঁধা রুটিন মাফিক দিন যাপন। সকাল ছ'টা থেকে দিনের শুরু—প্রথমে খেলার মাঠ শরীর-চর্চা, তারপর আটটা থেকে সাড়ে-দশটা আবার বারোটা থেকে চারটা অবধি স্কুলে ক্লাশ। বৈকাল পাঁচটা থেকে ছ'টা খেলার মাঠে। এখানে সূর্যোদয় সাড়ে ছ'টায়, সূর্যাস্ত সাতটার পর। প্রথমে কয়েকদিন হিমশিম খেলেও পরে সয়ে গেছে। মনে পড়ে স্বামীজিকে আর তাঁর রুটিন মেনে চলার অনুশাসন। বিশেষভাবে মনে পড়ে রবি ও বুধবারে বিকালে স্বামীজি যখন অনুরাগী ভক্তদের সাথে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত, আমি তখন সুদূর উদয়পুরে নিঃখাদ -একাকী।

প্রায় প্রতি দিনই সন্ধ্যায় স্কুল অডিটরিয়ামে (Auditorium) নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। বেশ বড় সুসজ্জিত অডিটরিয়াম। নানা দিনে নানা অনুষ্ঠান, নানা প্রাদেশিক লেখক সঙ্গীত, লোকনৃত্য, কবি সম্মেলন। সিনেমা আর ও কত কি। হিন্দি, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, মারাঠী সব ভাষাতেই। কেবল বাংলা নেই। নানা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেই এসেছে। মাতৃভাষা আলাদা হলেও পরস্পর আদান-প্রদানে ভাষা হিন্দি। যদিও অনেকেই দেখেছি হিন্দি ভাল বলতে পারে না। অনুষ্ঠান শেষ হত জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে। অপূর্ব লাগত পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাত, মারাঠা, দ্রাবিড় সকল বঙ্গ বাসীদের সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত শুনে। গর্বে বুক ভরে উঠত। এই তো প্রকৃত ভারতবর্ষ;

বিশেষভাবে মনে পড়ে তদানীন্তন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রমা চৌধুরীর "প্রাচ্য বাণী" সংস্থার সংস্কৃত নাটক অভিনয়। পর পর দু'রাত তাঁদের সংস্কৃত নাটক অভিনীত হল। প্রথম রাতে "অমর মীরম', দ্বিতীয় রাতে 'মেঘ মেদূর মেদিনীয়ম্'। প্রথম নাটক মীরা-জীবনী, দ্বিতীয় নাটক কালিদাসের মেঘদূত অবলম্বনে রচিত। উভয়ের লেখিকা স্বয়ং বিদুষী রমাচৌধুরী—বাংলার গর্ব। অনুষ্ঠানের প্রথমে শ্রীমতী চৌধুরী ইংরেজীতে দশ-পনেরো মিনিটের একটি ভাষণ দিতেন; তারপর অনুষ্ঠান শুরু হত। হল ভর্তি দর্শক মন্ত্র মুগ্ধ। রাজস্থানের মেয়ে মীরাকে নিয়ে নাটক তাত আবার দেবভাষা সংস্কৃত! সবাই আপ্লুত।

বিদুষী শ্রীমতী রমা চৌধুরী ও তাঁর 'প্রাচ্য বাণী' সংস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। ওনার লেখার সাথেও পরিচিত ছিলাম। কিন্তু নাটক দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম। খুব আগ্রহ সহকারে দু'রাতেই দেখেছি, আনন্দ পেয়েছি। বাংলার কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে পেলাম না বলে মনে যে আক্ষেপ ছিল তাও গেল। সবচেয়ে বড় কথা বাঙ্গালী হিসাবে আমার মর্যাদা বেড়ে গেল। অনেকেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন-করছে বাঙ্গালীরা এতভাল সংস্কৃত জানে? আমরা তো জানতাম বাঙ্গালী মাত্রই 'নক্‌শাল'। জানি না এরপর ওদের ধারণার সামান্যতম পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

বিস্তারিত জানিয়ে উদয়পুর থেকে স্বামীজিকে চিঠি লিখলাম। স্বামীজি Haimavati, 9/2 Fern Road, cal-19 থেকে 22.8.71 তারিখে স্নেহাশিস পাঠালেন,

আশু, তোমার m.o পেলাম। সুন্দর জায়গায় গিয়েছো। আনন্দে থেকো। স্নেহাশিস রইল? অনির্বাণ।

তারপর একই ঠিকানা থেকে ৫/৯/৭১ তারিখে লিখলেন,

"আশু, তোমার চিঠি পেলাম। ট্রেনিং-এর কাজে ব্যস্ত থাকার মধ্যেও মনটাকে মুক্ত এবং হালকা রাখার চেষ্টা করো। তার সঙ্গে ফাঁকে ফাঁকে আকাশ ভাবনা। তাহলে ক্লান্তি কম আসবে। তখন দিনের শেষে বিছানায় শুতে থাকার সময় একান্ত নিরালায় নিজেকে পাবে।

স্নেহাশিস
অনির্বাণ"

এবারে পূজা ছিল ২৬শে সেপ্টেম্বর মহাসপ্তমী ২৯শে বিজয়া দশমী তথা 'দশেরা'। টের পেলাম দুপুরে খাবার টেবিলে নানারকম রাজস্থানী ভোজের বিশেষ আয়োজন দেখে।

পূজায় আশে-পাশে কোন অনুষ্ঠান ছিল না। অষ্টমীর সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম প্রবাসী বন্ধু সমাজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পূজা মণ্ডপে—খুব বেশী দূরে নয়। আলাপ-পরিচয় হল অনেকের সাথেই। প্রবাসী হলেও তারা সম্পন্ন ও স্বচ্ছল। উদয়পুর নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের জন্মভূমি। জাকজমকহীন সাধারণ পূজা-মণ্ডপ; ঘরোয়া পরিবেশে নিয়ম-নিষ্ঠায় পূজা। প্রতিমাও খুব সাধারণ। তবে আদর আপ্যায়ণের কোন ত্রুটি ছিল না। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানর আয়োজন ছিল। তাও কিছুটা দেখে এলাম। সুন্দর অনুষ্ঠান।

উদয়পুর থেকেই স্বামীজিকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে Reply Card পাঠালাম; যেমন বরাবর পাঠাই। আশায় ছিলাম উদয়পুরেই স্বামীজির বিজয়ার স্নেহাশিস পাব। পাইনি।

গৌহাটি ফিরে এলাম ১৭ই অক্টোবর; কালীপূজার আগের দিন। অক্টোবর শেষ হয়ে নভেম্বর শুরু। ইতিমধ্যে স্বামীজিকে তিনখানা চিঠি পাঠিয়েছি। জবাব নাই। যা এ অবধি কোনদিন হয়নি। চিঠি লিখে জবাব পাই নি, এমন কখনো হয়নি। অগত্যা গৌতমবাবুকে Reply paid Telegram পাঠালাম। তাতেও সাড়া নেই। উদ্বিগ্ন রয়েছি। খুবই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে। ধ্যান-ধারণা, দৈনন্দিন কাজ-কর্ম কিছুতেই মন নেই। অবশেষে গৌতমবাবুর Telegram পেলাম। স্বামীজি খুবই অসুস্থ; চিঠিপত্র লিখতে পারছেন না।

আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে একদিন বিকেলে গোলপার্কে বেড়াতে যাওয়ার সময় মাঝপথে হঠাৎ তার মেরুদণ্ডের একটি হাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি রাস্তায় পড়ে যান। পথচারী লোকজন তাঁকে তোলার পর হেঁটে নিজে বাড়িতে চলে আসেন। দু-তিন দিন পরে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তারপর স্বামীজি যতদিন বেঁচে ছিলেন, উঠে আর বসতে পারেননি। দুঃখই দেহ-যন্ত্রণাকে সানন্দে গ্রহণ করে উদ্বিগ্ন অনুরাগী-ভক্তজনদের বলেছিলেন, 'আনন্দেই আছি।' রোগশয্যাকে তিনি যোগশয্যায় পরিণত করেছিলেন। তাঁর সেই সময় নানা দিব্যানুভব লাভ হয়েছিল। একদিন বলেছিলেন—"দেখছি ভগবৎ-অনুভূতির অন্ত নাই—কুল-কেনারা নাই। একটা অনুভূতি আসে, আর মনে পড়ে, বেদে উপনিষদে তো এই কথা আছে। সত্যিই আর্য-ঋষিরা কী না একটা আলোর ছটা জগৎকে দিয়ে গেছেন। কী জ্যোতির্ময় লোকে না তাঁরা থাকতেন।"

শ্রীমতী রেমঁজেনিভা থেকে তাঁকে শয্যাশায়ী অবস্থায় দেখতে এসেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি অসুস্থ অবস্থায় কোন দিব্যানুভব লাভ করেছেন কিনা। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন,— " Yes these years of illness have been for me a time of deep inner experinces, of many, many experiences; of deep Silence also, in which Kali, the eternal time has been flowing on.

I sleep two hours. Then awake, I simply close my eyes and remain very, Very quiet. Time flows on. This is Kali, the time's spirit the void. I think of Kali ....

There is something wonderful–aslong as I remain awake I think; "Well, I should have been dreaming, I am creating my dreams!" I see the awakened state and the great quietness that follows. If I look into it then I suddenly know, "Well, I am awake." It is all power. I am simply awake. All values which are put upon awameness mean nothing. Awakeness is freedom to see without entering into anything. By that you throw away so much of the weight of life, so much ballast you soar up."

স্বামীজি; দীর্ঘ সাত বছর শয্যাশায়ী থেকেও নানা জিজ্ঞাসুর সমস্যা ও সংশয় নিরসনে তৎপর ছিলেন। শুধু মৌখিক উপদেশ নয়, বহুজনকে বহু চিঠি তিনি শয়ান অবস্থায়। লিখেছেন, ৬। ৮।৭২ তারিখের একটি চিঠিতে স্বামীজি আমায় লিখেছেন, "আশু তোমার m.o. আর চিঠি পেয়েছি। শুয়ে শুয়ে চিঠি লেখা কষ্টকর। শরীরও খুব দুর্বল। তাই আজকাল বেশী চিঠি লিখতে পারি না। দেখাকরার দিন রবি আর বুধই আছে। তুমি ৪।। টায় এসো। *** *** অনির্বাণ।

তথাপিও এই সময়ে আমি স্বামীজির কাছ থেকে ১৪১টা চিঠি পেয়েছি এবং তারমধ্যে পৃষ্ঠাভর দীর্ঘ চিঠিও আছে। শেষ চিঠি লিখেছেন ২৪.৫.৪৭ তারিখে, পেয়েছি ৩১.৫.৭৮-এ যেদিন স্বামীজি চলে গেলেন।

—ঃঃ—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st October 2024
Ashwin–1431
Vol. 22. No. 6

REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৬ই অক্টোবর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৩ই অক্টোবর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২০শে অক্টোবর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৭শে অক্টোবর, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.